নারী আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি

মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র

নারী আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি

মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ: ১৫ জুলাই ২০১৭

বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র

কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক, ২২/১ তোপখানা রোড
(৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।
ফোন ও ফ্যাক্স: ৯৫৭৬৩৭৩
ই-মেইল: narimuktikendra@gmail.com

মূল্য: ২০ টাকা

ভূমিকা

বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় কমিটি ঢাকায় গত ২৩-২৪ মে '১৪ দু'দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় কর্মশালার আয়োজন করেছিলো। 'আইনে নারী অধিকার: প্রাসঙ্গিকতা ও বাস্তবতা' শীর্ষক দু'দিনের এই কেন্দ্রীয় কর্মশালা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার থিয়েটার ভবনের উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রের সেমিনার রুম ও আর.সি. মজুমদার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় বিভিন্ন জেলা থেকে সংগঠনের প্রতিনিধি ও পার্টির বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছিলেন। কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী নারী আন্দোলন গড়ে তোলার নানাদিক নিয়ে আলোকপাত করেন। আজকের সময়ে নারী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র এই বক্তব্যটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। পরবর্তীতে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ঐ বক্তব্যটি সম্পাদনা করেন। সম্পাদিত বক্তব্যটি আমরা 'নারী আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি' শিরোনামে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করছি।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার আলোকে প্রদত্ত তাঁর এই বক্তব্য বাংলাদেশের নারীমুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পাথেয় ও দিক-নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে বলে আমরা মনে করি।

নারী আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি

বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র আয়োজিত আজকের এই কর্মশালায় উপস্থিত সভাপতি, সংগঠনের নেতা-কর্মীবৃন্দ,

বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র, একটা বিপ্লবী পার্টির সাথে সম্পর্কিত নারী আন্দোলনের সংগঠন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে জীবনের সর্বক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে যে বিপ্লবী রাজনীতির কথা আমরা বলি, তার আলোকে আমরা সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে নানাভাবে সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করি। নারীদের মধ্যেও এ সংগঠনের মাধ্যমে আমরা কাজ করি। এই সংগঠনের নেতা-কর্মী ছাড়াও দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীবৃন্দ অনেকে এখানে এসেছেন। আমি নারী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের করণীয় সম্পর্কে বলার পাশাপাশি দলের অন্যরা এই সংগঠনকে কীভাবে দেখবে, আমাদের মেয়েদের কীভাবে সাহায্য করবে, কী দৃষ্টিভঙ্গীতে করবে-সে সম্পর্কেও কিছু বিষয় আলোকপাত করবো।

নারীদের শৃঙ্খলিত হওয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

নারীমুক্তির প্রশ্নটা একটা বিশেষ ধরনের প্রশ্ন। মেয়েরা সমাজের অর্ধাংশ। সারা বিশ্বেই পুরুষের পাশাপাশি নারী অবস্থান করে, তাদেরকে নিয়েই মানবসমাজ। কিন্তু যে সামাজিক ব্যবস্থায় আমরা বসবাস করছি, সেটা একটা শ্রেণিবিভক্ত সমাজ। মানুষের সমাজ যখন শ্রেণিবিভক্ত হলো, ঠিক তখনই, মেয়েদের যে সামাজিক অবস্থান আদিমকালে ছিলো, সেই জায়গায় একটা মৌলিক পরিবর্তন হয়ে গেলো। এই বিষয়টা আপনাদের গুরুত্ব দিয়ে বুঝতে হবে। তা না হলে অনেক কিছুই বুঝতে পারবেন না। ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস্ তাঁর 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' বইয়ে এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। আমি সংক্ষেপে কিছু কথা বলবো।

আদিম সমাজে মেয়েরাই প্রাধান্য নিয়ে অবস্থান করতো। মানুষ তার বেঁচে থাকার প্রয়োজনে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকতো। সে ছিলো প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। আবার যেহেতু মানুষের নতুন প্রজন্ম সৃষ্টির কাজটি প্রাকৃতিক নিয়মের কারণে নারীকে কেন্দ্র করে ঘটে, সেজন্য আদিমকালে মেয়েদের একটা বিশেষ ধরনের সামাজিক ভূমিকা ছিলো। অর্থাৎ এখনকার মতো করে তখন পরিবারের জন্ম হয়নি, ফলে সন্তানের সামাজিক পরিচিতি মেয়েদেরকে কেন্দ্র করে হওয়ার কারণে তাদেরকে কেন্দ্র করেই সমাজ আবর্তিত হয়েছে। তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থাটি নারীদের আধিপত্যমূলক ও তাদের প্রাধান্যের সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবেই ছিলো। মানুষ তখন সম্পূর্ণ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল, ফলমূল সংগ্রহ, শিকার ইত্যাদির মাধ্যমে সে জীবনধারণ করতো। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতো। কারণ কোনো স্থানে বহুকাল ধরে অবস্থান করলে, সে স্থানে এক সময় খাদ্যের সংকট তৈরি হতো। ফলে তাকে স্থানান্তরিত হতে হতো। এই স্থানান্তরিত

হওয়ার প্রক্রিয়া যতদিন ছিলো, ততদিন নারীদের প্রাধান্যের ভিত্তিতে সমাজ পরিচালিত হয়েছে। এরপর সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের বেঁচে থাকার প্রক্রিয়াও পাল্টাতে থাকলো। বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মানুষ তার মস্তিষ্কে এক বিশেষ ধরনের ক্ষমতা অর্জন করেছে। একে বলে 'Power of Translation'। মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য প্রকৃতির সাথে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্বে যেতে হয়, সেই দ্বন্দ্বে মানুষের এই 'Power of Translation' থাকার কারণে মানুষ নানাভাবে প্রকৃতিকে পাল্টাবার সংগ্রাম করতে থাকলো। অর্থাৎ অন্যান্য প্রাণীকে যেখানে প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে টিকে থাকার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়, সেখানে মানুষ প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার করে তাকে পাল্টাতে শুরু করলো। এই করতে করতে ধীরে ধীরে সে স্থায়ী উৎপাদনের দিকে গেলো। কৃষিকাজকে কেন্দ্র করেই বাস্তবে স্থায়ী উৎপাদন ও স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু হলো। এই কৃষিকাজ যখন মানবসমাজে এলো, তখনই শ্রমের মূল্য তৈরি হলো। একদিকে শ্রমের মূল্য তৈরি হলো, যা মানুষ বুঝতে শিখলো, অন্যদিকে প্রাকৃতিক নিয়মেই যেহেতু মেয়েরা সন্তান ধারণ করতো, সেই কারণে সন্তান ধারণের ওই সময়টায় মেয়েরা শ্রমের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে গেলো। অর্থাৎ তখনকার প্রয়োজনীয় যে শ্রম, তা সন্তান ধারণের সময়টাতে সে আর দিতে পারতো না। এটা তাদের পিছিয়ে পড়ার একটা দিক।

আবার তখন শ্রমকে কেন্দ্র করেই বেঁচে থাকতে হতো। কৃষি আবিষ্কারের পর বেঁচে থাকার জন্য যে উৎপাদন তারা করতো তা থেকে উদ্বৃত্ত হতো। এই উদ্বৃত্তটুকু একটা আপেক্ষিক সাময়িক উদ্বৃত্ত, বাস্তবে একটা অভাব। আমি বলতে চাইছি, তাদের ব্যবস্থা ছিলো এরকম যে, এই মুহূর্তের ভোগের জন্য তারা এই মুহূর্তে উৎপাদন করছে, এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে শ্রম দিচ্ছে। অর্থাৎ একটা ফল পাচ্ছে, খাচ্ছে–এই পরিস্থিতি থেকে একটু উত্তরণ ঘটলো। এখন উৎপাদন করছে, কিছু সঞ্চয় করবার অবস্থা হয়েছে, কিন্তু সেটা সেই মুহূর্তে, খুবই অল্প সময়ের জন্যে। একটা বিরাট সময়ের বিস্তৃতিতে ভাবলে সেটাও একটা অভাব। এবার সেই উদ্বৃত্তকে রক্ষণাবেক্ষণ ও তার উপরে কর্তৃত্ব করার প্রশ্ন তৈরি হলো। কর্তৃত্ব করার প্রশ্ন বাস্তবে অভাবকে কেন্দ্র করে কর্তৃত্ব। যতটুকু এই মুহূর্তের উদ্বৃত্ত, সেটাকে দখল করা। কারণ অভাব অনেক। দখল করার প্রয়োজনের ধারণা মানবসমাজে বহুকাল ছিলো না। উদ্বৃত্তের উপর এই কর্তৃত্বের প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হলো।

সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হওয়ার পর, যে প্রাকৃতিক নিয়মের কারণে সমাজে নারীর প্রাধান্য ছিলো সেটার অবসান ঘটে। কৃষিকে কেন্দ্র করে স্থায়ী জীবনের প্রয়োজন ও সেকারণে পরিবার গঠনের প্রয়োজনীয়তা তখনকার সমাজে আসা শুরু করে। এই সময় থেকেই মেয়েরা সামাজিক জবরদস্তির মধ্যে পড়ে যায়। এই জবরদস্তি কিন্তু শ্রেণিবিভক্ত সমাজের প্রয়োজনের ভিত্তিতেই জবরদস্তি। এই সময় থেকেই শুরু হলো নারীদের পরাজয় এবং সমাজের উপর পুরুষ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। সমাজ তখন শ্রেণিবিভক্ত, আবার স্থায়ী উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে পারিবারিক ব্যবস্থার জন্মও হয়েছে। এই

পারিবারিক ব্যবস্থার মধ্যে গৃহস্থালি জীবনযাপনের প্রয়োজন এসেছে। এই সামাজিক পরিস্থিতিতে, এ প্রয়োজনকে ভিত্তি করে মেয়েদের ঘরে বন্দী করা হলো। আগের যে অবাধ বিচরণ তাদের ছিলো, সেটা নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেলো। এই নিয়ন্ত্রণ মেয়েরা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে মানতে চায়নি। অনেক জবরদস্তি, অনেক রক্ত, অনেক লড়াইয়ের বিনিময়ে, ধীরে ধীরে বহুকাল এইভাবে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত একে মেনে নিতে তাদের বাধ্য করা হয়েছে। সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হওয়ার আগে, পরিবার গঠনের আগে নারীদের যে অবাধ বিচরণ ছিলো, তার কারণে প্রাকৃতিক নিয়মে তার যে আধিপত্য ছিলো, সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হওয়ার পর, স্থায়ী উৎপাদন ব্যবস্থা ও পরিবার গঠনের পর নারীর সে অবস্থান আর থাকলো না। ফলে যে সমাজ এলো, সেখানে মেয়েদের ওপর জবরদস্তির মধ্য দিয়ে তাদের গৃহস্থালি জীবনে যেতে বাধ্য করা হলো, অবাধ বিচরণের ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রিত করা হলো। তখন সে তার স্বাধীন অবস্থান থেকে পরিবর্তিত হয়ে পুরুষের কর্তৃত্বের অধীনস্থ হয়ে গেলো।

বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্যই তার উপরিকাঠামোসমূহের সৃষ্টি হয়

আমরা এটাই বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম যে, মানবসমাজ শ্রেণিবিভক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে কিভাবে পুরুষের কর্তৃত্বের মধ্যে নারীদের চলে যেতে হলো এবং এরই প্রেক্ষিতে সমাজে কিভাবে পুরুষ কর্তৃত্বের জন্ম হলো। এটা একটা দিক। এর আরেকটা দিক হলো এই যে, সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হওয়ার কারণে বেশিরভাগ পুরুষও দাসে পরিণত হলো। অর্থাৎ শুধু মেয়েরাই তাদের স্বাধীনতা হারালো না, শ্রেণিবিভক্তির কারণে দাস এবং দাস মালিকের সমাজ সৃষ্টি হওয়ার মধ্য দিয়ে সমাজের সকল মানুষই মুষ্টিমেয় দাস মালিক ও বিরাট সংখ্যার দাস–এই দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। এই বিভক্তির মধ্য দিয়ে অর্থাৎ একদিকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অন্যদিকে স্বাধীনতা হরণ–এর মধ্য দিয়েই সেই সময়ের সামাজিক জীবন আবর্তিত হতে লাগলো। জবরদস্তির মধ্য দিয়ে মেয়েদেরকে পুরুষের কর্তৃত্বের অধীনে যেতে বাধ্য করা হলো, এটা ঠিক। কিন্তু এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, বিশাল জনগোষ্ঠীকে শুধু গায়ের জোরেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, তারা তা করেওনি। তখনকার সময় সমাজে যে সামাজিক প্রয়োজনগুলো এসেছিলো, সমাজব্যবস্থার সেই প্রয়োজন আবার অতীতের সমাজব্যবস্থার অকার্যকারিতা–এই দুই বিষয় মিলে নতুন সমাজের প্রয়োজনের পরিপূরক যুক্তিসমূহ মানুষের ভাবনায় এসেছে। তখনকার সমাজব্যবস্থা উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বের কারণে যে বাস্তব সমস্যার মধ্যে পড়েছিলো তা থেকেই এই চিন্তাসমূহ এসেছে। এর মানে এই যে, সেই সময়ে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে তুলনামূলক ভালো অবস্থায় সমাজ এসেছিলো দাস সমাজের জন্ম হওয়ার মধ্য দিয়েই। উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বে বর্ধিত উৎপাদিকা শক্তিকে ধারণ করার জন্য এই ছিলো সমাজ বিকাশের রাস্তা। মানুষ অতীতে যে জন্তু-জানোয়ারের মতো অবস্থায় ছিলো এই নতুন সমাজব্যবস্থায় এসে সে কিছু সামাজিক নিয়ম-কানুন ও শৃঙ্খলার মধ্যে এলো এবং সমাজ পরিচালনার জন্য, তার

প্রতি আনুগত্য সৃষ্টির জন্য, সেই আনুগত্যের প্রাতিষ্ঠানিকতা তৈরি করার জন্য মানুষ তার পক্ষে একটা যুক্তি কাঠামোও দাঁড় করালো। এভাবে ধীরে ধীরে সেই সামাজিক ব্যবস্থার উপযোগী উপরিকাঠামো তৈরি হলো। সেই সমাজব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য সৃষ্টির জন্যে মানুষকে নানাভাবে যুক্তি বিবেচনা দেয়া হতে লাগলো। এভাবে নারীদের অধস্তন অবস্থাও সামাজিক প্রয়োজনেই যুক্তিযুক্ত করা হলো, নারীদের তা মানতে বাধ্য করা হলো।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবই নারীর সমানাধিকারের কথা সমাজে এনেছিলো

ঈশ্বরতত্ত্বের জন্ম হওয়ার পর থেকেই প্রায় সকল সামন্তীয় সমাজে মেয়েরাই সকল পাপের প্রতিভূ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সামন্ত সংস্কৃতি হলো ধর্ম কেন্দ্রিক সংস্কৃতি। ফলে সামন্ত সমাজ মেয়েদের সম্পর্কে এমন নেতিবাচক ধারণা নিয়েই মূলত চলেছে। এই সামন্তচিন্তার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব, ফ্রান্সের ফরাসি বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ইত্যাদি বড় বড় বিপ্লব সমূহ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে ঘটেছিলো। এইসব বিপ্লবের পরিপূরক সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের দিক থেকেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনা অর্থাৎ Equality (সাম্য), Faternity (মৈত্রী) ও Liberty (স্বাধীনতা) এর ধারণার জন্ম হয়েছিলো। রেনেসাঁ ইউরোপের সমাজে যে Termoil তৈরি করেছিলো তা থেকেই নারী-পুরুষের সাম্যের ধারণা, নারীদের শ্রমের মূল্য–এই প্রশ্নগুলো সমাজে এসেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় 'মেয়েরা ও ছেলেরা অধিকারে সমান'–এই কথাটি বুর্জোয়ারা মানবসমাজে এনেছিলো। মেয়েদের ঘরের বাইরে আসার ভিত্তি তৈরি হয়েছিলো। Industrial Life-কে কেন্দ্র করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের ধারণাও সমাজে এসেছিলো। বাস্তবে অর্থনৈতিক জীবনে স্বাতন্ত্র্যের যে ধারণাগুলি এসেছিলো, সেগুলো সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেও পরিবর্তন নিয়ে এলো। আর একে ধারণ করার মধ্য দিয়েই মেয়েরা ঘরের বাইরে এসেছিলো। কিন্তু পুঁজিবাদ পুনরায় যে সামাজিক ব্যবস্থা চালু করলো সেটিও একটি শোষণমূলক সামাজিক ব্যবস্থা। শোষণমূলক সামাজিক ব্যবস্থা হবার কারণে অনেক ভালো কথা নিয়ে পুঁজিবাদের যাত্রা শুরু হলেও নারীরা আবার সেই একই নিয়ন্ত্রণ ও জবরদস্তির মধ্যে পড়লো। কারণ যতক্ষণ শোষণ আছে ততক্ষণ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করে নারীদের মুক্তির সুযোগও নেই। শোষণমূলক সমাজকে ভিত্তি করেই নারীদের উপর অবদমন এসেছিলো, এই শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার অবসান ব্যতিরেকে নারীর সর্বাঙ্গীন মুক্তি হবে না।

বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণাই ভ্রান্ত নারীবাদী চিন্তার জন্ম দিয়েছে

এই সমানাধিকারের কথা বুর্জোয়ারা মুখে বললেও সমাজে তা প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়নি। এজন্য মেয়েদেরকে লড়তে হয়েছে। ফরাসি বিপ্লবের ধারাবাহিকতায় ইউরোপে একটা সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি দীর্ঘদিন ধরেই চলছিলো। শিক্ষার ক্ষেত্রে, শ্রমের মজুরির ক্ষেত্রে, ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে লড়াই হয়েছে। ফরাসি বিপ্লবে শ্রমজীবী নারীরা গৌরবোজ্জ্বল লড়াই করেছিলেন। সে সময় ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্য থেকে নারীমুক্তির দাবি তুলেছিলেন মাদাম রোঁলা ও লুসিল দেমুলাঁ। গণতান্ত্রিক

নারীমুক্তি আন্দোলনে মেরী ওলস্টোন ক্র্যাফটের 'A vindication of the rights of woman' গতি সঞ্চার করেছিলো। এগুলো বিভিন্নভাবে নারীর অধিকার নিয়ে কথা তুলেছে।

নারীমুক্তির আন্দোলন সবচেয়ে গতি পেয়েছিলো সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে থাকা নারীদের নেতৃত্বে। কারণ উনবিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন ও সর্বহারা শ্রেণির মুক্তি আন্দোলন বিভিন্ন দেশে শ্রমজীবী নারীদের অধিকার ও দাবি-দাওয়ার জন্য কাজ শুরু করেছিলো। দীর্ঘ ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক নারীনেত্রীরাই 'নারী দিবস'কে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং নারীমুক্তির আন্দোলনকে বেগবান করেন। সমাজতান্ত্রিক নারী আন্দোলনের নেত্রীরা সমাজ নিরপেক্ষ নারী আন্দোলন করতেন না। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, নারীমুক্তির কথা পুঁজিবাদ এনেছিলো কিন্তু তা নারীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে ব্যর্থ। তাই নারীমুক্তির আন্দোলন আর শোষণমুক্তির আন্দোলন আজ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

এরপর পঞ্চাশ এর দশকে পাশ্চাত্যে ফেমিনিস্ট নেতারা যে ধরনের নারী স্বাধীনতার ধারণা নিয়ে এলেন তার সাথে প্রকৃত নারীমুক্তির আন্দোলনের অনেক পার্থক্য। বলা হয়ে থাকে গুস্তাভ ফ্লুভেয়ারের 'মাদাম বোভারি' প্রথম নারীবাদী ধারণা নিয়ে আসে। 'মাদাম বোভারি' এই ধারণা আনলো যে, "This is my body, my sex. I shall decide to whom I shall offer it." সেই সময়ের সাপেক্ষে সেটি ছিলো প্রগতিশীল চিন্তা। কিন্তু সেই স্বাধীনতার ধারণাকে absolute করে ফেলার মধ্য দিয়েই শুরু হলো বিকৃতি।

এই নারীবাদী আন্দোলন, আমি আগেই বলেছি, এর সাথে প্রকৃত 'নারীমুক্তির আন্দোলনের অনেক ফারাক, এর উৎপত্তি মূলত উগ্র ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণা থেকে। এদিক থেকে অস্তিত্ববাদ, পোস্ট মডার্নিজম ইত্যাদির সাথে এর দর্শনগত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পুঁজিবাদ তার মরণদশায় মৃত্যু ঠেকাবার জন্য যেসকল দর্শন আমদানি করেছে, আধুনিক নারীবাদীদের বিভিন্ন ধারাকে বিশ্লেষণ করলে সেই দর্শনসমূহের সাথে তার মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে ইউরোপে যখন এ ধরনের আন্দোলন শুরু হয় তখন এর সামনে ছিলেন বেলি ফ্রাইডান, জার্মেইন গ্রিয়ার, ক্যারোলিন বার্ড প্রমুখ। এদের বৈশিষ্ট্য যদি আমরা পর্যালোচনা করি তবে দেখবো অনেকগুলো ভুল চিন্তা এই নারীবাদী আন্দোলনের মধ্যে ক্রিয়া করেছে। **প্রথমত,** যে ঐতিহাসিক কারণে নারী পুরুষের অধীনস্থ হয়েছিলো, বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করে সেগুলোকে বুঝতে পারা ও সেই মূল কারণগুলো সমাজদেহ থেকে উৎপাটিত করার সংগ্রামের পরিবর্তে নারীর পরাধীনতার জন্য তারা সমগ্র পুরুষ জাতিকে দায়ী মনে করলেন।

দ্বিতীয়ত, এদের অনেকে প্রভুত্ব করা, অবদমন করা ইত্যাদিকে পুরুষের জীববৈজ্ঞানিক ও জিনগত বৈশিষ্ট্য বলে মনে করলেন। আবার যথার্থ কারণ অনুসন্ধান না করে অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে তারা পুরুষের ভোগাকাঙ্ক্ষা, বিকৃত রুচি, প্রভুত্বলিপ্সাকেই

নারীর পরাধীনতার কারণ মনে করলেন। ফলাফলে এরা পুরুষ বিদ্বেষী হয়ে পড়লেন। **তৃতীয়ত,** এই বিদ্বেষ ও 'যার সাথে ইচ্ছা শারীরিক সম্পর্ক' করার উগ্র স্বাধীনতার ধারণার ফলে এদের অনেকে দৈহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নর-নারীর পারস্পরিক প্রয়োজনীয়তার দিকটাই অস্বীকার করে বসলেন। সেই সাথে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ যে সকল অন্যায় সুযোগ-সুবিধা চাইলে ভোগ করতে পারে, যা তাদের পদে পদে ছোট করে, নারীর জন্য সেই প্রিভিলেজগুলো আদায় করাকেই তারা নারী স্বাধীনতার দাবি বলে মনে করলেন।

চতুর্থত, গর্ভের সন্তান রাখা কিংবা নষ্ট করা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা নারীর অধিকার দাবি করলেন। অর্থাৎ পুরুষশাসিত সমাজে যেহেতু এগুলো পুরুষের ইচ্ছায় ঘটে সেহেতু সেখানে নারীর অধিকার দাবিকেই তারা নারী স্বাধীনতা বলে মনে করলেন। তারা বুঝতে পারলেন না যে, সন্তান রাখা কিংবা নষ্ট করার ক্ষেত্রে পুরুষ বা নারীর ইচ্ছা নয়, সামাজিক প্রয়োজনটাই বড় কথা। কিন্তু নিকৃষ্ট ভোগবাদ আজ নারী-পুরুষের মনকে এভাবে আচ্ছন্ন করেছে যে, অনেকেই নিছক ব্যক্তিগত সুবিধা অটুট রাখার জন্য দায়িত্ব এড়াতে সন্তান ধারণ বা পালন করতে চান না। যৌনজীবনকে এরা সামাজিক দায়িত্বহীন ব্যক্তিগত ভোগসুখের বিষয়ে দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন। এরা দেহের চাহিদাকে তৃপ্ত করবেন কিন্তু সামাজিক দায়িত্ব নিতে নারাজ। ফলে 'গর্ভের উপর নারীর একান্ত অধিকারের কথা' শুনতে আধুনিক মনে হলেও এর মধ্য দিয়ে সেই নিকৃষ্ট ভোগবাদী চিন্তারই প্রতিফলন ঘটলো।

পঞ্চমত, এরা মনে করেন যে, মার্কসবাদ নারীমুক্তির ব্যাপারে কোন পথনির্দেশ করতে পারে না। কারণ মার্কসবাদ নারীদের সমস্যাকে শ্রেণিভিত্তির প্রেক্ষিতে বুঝতে চায়। কিন্তু নারীদের সমস্যা শ্রেণি শোষণের কারণে সৃষ্ট নয় আবার তা ব্যক্তি সম্পত্তিকেন্দ্রিক মানসিকতার সাথেও যুক্ত নয়। এর মূল কারণ হলো পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্ব।

সংক্ষেপে 'ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট'-এর সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা আমি বললাম। যদিও এর বিভিন্ন ধারা আছে এবং ভিন্ন ভিন্ন ধারণাও আছে। এ থেকে একটা কথা অন্তত আপনারা বুঝতে পারছেন যে, এই আন্দোলনের মধ্যে নারীর শৃঙ্খলিত হওয়ার ঐতিহাসিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের আলোচনা, তার বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণ–কিছুই নেই। ফলে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করার কারণে এ আন্দোলন ক্রমেই বিকৃতির দিকে গেছে। এমনকি নারীবাদী আন্দোলনের ধারা থেকে পরবর্তীতে অন্তর্বাস পোড়ানো কিংবা পতিতাবৃত্তিকে আইনসঙ্গত করা ইত্যাদি কর্মসূচিও গৃহীত হয়েছে।

অবিভক্ত ভারতবর্ষে ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রভাব

অবিভক্ত ভারতবর্ষে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ইউরোপীয় রেনেসাঁর সাম্য, মৈত্রী ও নারী স্বাধীনতার ধারণাগুলি কথার অর্থে খানিকটা এনেছিলো। রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এসব আশা-আকাঙ্ক্ষা সমাজে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তৎকালীন ভারতবর্ষে নারীদের উপর চাপিয়ে দেয়া সামাজিক

কুসংস্কার-কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে রামমোহন-বিদ্যাসাগর সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। রামমোহন রায় 'সতীদাহ' প্রথা রোধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি শাস্ত্রকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, শাস্ত্রে সতীদাহকে ন্যায্যতা দেয়া হয়নি। 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের সম্বাদ' নামে একটি বই লিখেন তিনি। সেখানে গোঁড়া হিন্দুদের বিভিন্ন যুক্তি তিনি খণ্ডন করেন। নারীদের সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও উচ্চ মানবিকতার প্রকাশ এসকল লেখায় আছে। গোড়া হিন্দুদের বক্তব্য ছিলো, 'সতীদাহ না থাকলে নারীরা বিশ্বাসঘাতক হয়ে উঠবে'। রামমোহন এর উত্তরে বলেন, "এ দোষ স্ত্রীতে অধিক কি পুরুষে অধিক উভয়ের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই তা বোঝা যাবে। প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে কত স্ত্রী পুরুষের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে আর কত পুরুষ স্ত্রীর দ্বারা প্রতারিত হয়েছে–তার সংখ্যা হিসাব করলেই তা বোঝা যাবে।" শাস্ত্রজ্ঞরা বলতেন, 'স্ত্রীলোক স্বল্পবুদ্ধি, অস্থিরচিত্ত ও বিশ্বাসের অপাত্র।' রামমোহন এর জবাবে বলেন, "বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে কোন ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ না করতে পারে তখন তাকে স্বল্পবুদ্ধি বলা সম্ভব। আপনারা স্ত্রীলোকদের বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ প্রায় দেন নাই। তাহলে তারা বুদ্ধিহীন এ সিদ্ধান্তে কিভাবে আসলেন?" এরকম সহস্র যুক্তি তিনি দেখিয়েছেন। একদিকে সতীদাহের বিরুদ্ধে যুক্তির লড়াই, অন্যদিকে তা বন্ধ করার কার্যকর উদ্যোগ–এ দুই-ই তিনি করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত সতীদাহকে এদেশে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করতে পেরেছেন। রামমোহন হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামির বিপরীতে ধর্মীয় সংস্কার সাধন করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি 'ব্রাহ্ম ধর্ম' চালু করেছিলেন। ব্রাহ্মসভার সদস্যদের দিয়ে তিনি সমাজ সংস্কারের কাজ এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন।

রামমোহনের পর বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারের এই ঝাণ্ডা তুলে ধরেন। রামমোহনের সাথে তাঁর পার্থক্য ছিলো এই যে, তিনি ধর্মীয় সংস্কারের দিকে যাননি, বরং ইউরোপীয় রেনেসাঁর যে সেক্যুলার মানবতাবাদী ধারা সেটাকেই এদেশের বুকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তিনি মনে করতেন সাংখ্য-বেদান্ত ভ্রান্ত দর্শন। কিন্তু সহসাই যেহেতু এগুলোকে পাঠ্যসূচি থেকে তুলে দেয়া যাবে না, তাই সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের পাঠ্য তালিকায় তিনি জন স্টুয়ার্ট মিল'র লজিক রাখতে চেয়েছেন। যাতে ছাত্ররা এ দু'য়ের পার্থক্য বুঝতে পারে। ব্যক্তিজীবনে জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণের সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে ছিলেন তিনি। যেখানেই মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখেছেন, সেখানেই ছুটে গেছেন, সমাজ কী বলবে তার বিবেচনা করেননি। ডোমের বস্তি থেকে পতিতাপল্লী পর্যন্ত যেখানেই নিরুপায়, অসহায় মানুষ দেখেছেন–সেখানে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। কথা উঠলে বলেছেন, "আমি দেশাচারের দাস নই। সমাজের মঙ্গলের জন্য যা করা উচিত তা করবো।" বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অল্প বয়সে বিধবা হওয়া নারীদের অবর্ণনীয় কষ্টের জীবন তাঁকে কাঁদিয়েছিলো। এ নিয়ে সারাজীবন তিনি লড়েছেন। নিজের সমস্ত সম্পদ এর পেছনে ব্যয় করেছেন। বাল্যবিবাহ রোধ, বহুবিবাহ রোধ, বিধবা-বিবাহ প্রচলন, নারীশিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি জীবনপাত করেছেন, অসংখ্যবার

অপমান সহ্য করেছেন, প্রচুর টাকা ঋণগ্রস্ত হয়েছেন। এ ধরনের চরিত্র গোটা ভারতীয় নবজাগরণের যুগেও বিরল।

পরবর্তীকালে বাংলার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা সাহিত্যচিন্তা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক পরিবর্তনের আশা-আকাঙ্ক্ষাসমূহের চর্চা করেছেন। সে সময়ে বড় চরিত্রসম্পন্ন কিছু মানুষের অভ্যুত্থান এদেশে ঘটেছিলো এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, একটা রেনেসাঁর জন্ম হয়েছিলো। ইউরোপীয় রেনেসাঁর মতো ততখানি সামাজিক ব্যাপ্তি তার ছিলো না ঠিক, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ইউরোপীয় রেনেসাঁর সাথে পাল্লা দেবার মতো বড় চরিত্র এখানে সেই সময় সমাজে সৃষ্টি হয়েছিলো। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চিন্তা তখন এসেছিলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পত্তনের জন্য স্বাধীন ব্যক্তি সৃষ্টি করার প্রয়োজন থেকে। সমাজে তখন স্বাধীন নর-নারী সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো। কারণ উৎপাদনের বিরাট ক্ষেত্রকে কাজে লাগাতে হলে নারী-পুরুষদের সামন্ত সমাজের জবরদস্তির মধ্য থেকে, কুসংস্কারের প্রভাব থেকে বের করতে হয়। ইউরোপে একাজ করেছিলেন রুশো, ভলতেয়ার, শেক্সপিয়র, বালজাক-এর মতো সাহিত্যিকেরা। ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে এ পরিবর্তন কিছুটা এসেছিলো হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। ঐতিহাসিক নানা কারণে মুসলমানদের মধ্যে এ পরিবর্তন ততটা আসেনি। সে আরেক আলোচনা, তাতে আমি যাচ্ছি না। কিন্তু একথা ঠিক যে, মুসলমানদের মধ্যে ভারতীয় রেনেসাঁর প্রভাব ততখানি মাত্রায় পড়েনি।

তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন বেগম রোকেয়া। এই মহীয়সী নারী অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মেয়েদের বের করার জন্য একা একা লড়েছেন। গোটা সমাজকে একদিকে রেখে তিনি উল্টোদিকে দাঁড়িয়েছেন। এটা শুধু জেদ থাকলেই হয় না। তখনকার সমাজকেও তাঁর বুঝতে হয়েছে। তাদের সাইকোলজি বুঝে, আবার তাদের চিন্তার বিরুদ্ধে লড়াই করে করে, একটু একটু করে তাঁকে এগোতে হয়েছে। তিনি এজন্য প্রবন্ধ লিখেছেন, সাহিত্য রচনা করেছেন, নারীদের নিয়ে আলাদা সংগঠন গড়ে তুলেছেন, মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে তিনি সমাজপতিদের নানা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করেছেন। যখন তিনি এসব করছেন, সেসময়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের কোনো পুরুষ এই সাহস করতে পারেনি। এদিক থেকে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। গোটা মুসলমান সমাজে তাঁর সময়ে কোনো পুরুষের নাম করা যাবে না যিনি তাঁর মতো করে সামাজিক প্রথা ভাঙার বিরুদ্ধে লড়েছেন।

কিন্তু রেনেসাঁকে কেন্দ্র করে সামাজিক আন্দোলন ইউরোপে যে ব্যাপকতা নিয়ে এসেছিলো অবিভক্ত ভারতবর্ষে সেটা ততটা আসতে পারেনি, কারণ বিশ্ব বুর্জোয়া শ্রেণি তখন প্রতিক্রিয়াশীল রূপ ধারণ করেছে। তারই অংশ হিসেবে ভারতে যে পুঁজিবাদের জন্ম হয়েছে, সেই পুঁজিবাদ ছিলো সামন্ত সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ–এই দু'য়ের সাথে আপোষমুখী। এই নতুন পুঁজিবাদ; সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের সাথে মীমাংসার মধ্য দিয়ে চলছিলো। সামন্ত সমাজের সমস্ত

আপোষকামিতাকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে একটা নতুন বিপ্লবাত্মক চিন্তা ধারণ করার মতো শক্তি তাদের ছিলো না। রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও তাদের পরবর্তীতে সাহিত্যে শরৎচন্দ্র ও নজরুলের মধ্যে এই বিপ্লবাত্মক ভূমিকা দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথও ইউরোপীয় রেনেসাঁর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি বিধবা বিবাহের সমর্থক ছিলেন। নিজের ছেলে রথীন্দ্রনাথকে তিনি একজন বিধবার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। অসবর্ণ (অর্থাৎ হিন্দুসমাজের বর্ণপ্রথা ভেঙে) বিবাহে প্রত্যক্ষ সমর্থন দিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। ১৯৩১ সালের দিকে কবি অনুরাগী সুরেন্দ্রনাথ করের বিবাহ হয় শান্তিনিকেতন আশ্রমের সঙ্গীত শিক্ষিকা রমা মজুমদারের সাথে। এ বিয়ে নিয়ে সামাজিক বাধা সৃষ্টি হয়। কারণ পাত্র সুরেন্দ্রনাথ, পাত্রী রমা মজুমদারের চেয়ে নীচুবর্ণের ছিলেন। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারী তখন এ বিষয়ে তর্ক তোলেন। রবীন্দ্রনাথ বিয়ের কিছুদিন আগে এক চিঠিতে বিয়ের পক্ষে মত দিয়ে বলেন, "সুরেন মানুষ হিসেবে অধিকাংশ সৎ কুলীনের চেয়ে বুদ্ধিমান ও প্রতিভাসম্পন্ন, তথাপি নুটুকে (রমা) তার ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও অনুরাগ সংযত করতেই হবে অর্থাৎ বিনা কারণে নিজের ও সুরেনের ধর্মসঙ্গত ইচ্ছাকেই অপমানিত করতে হবে–এটা হিন্দু সমাজসম্মত তা মানি, কিন্তু শ্রেয়স্কর তা কিছুতেই মানিনে।"

রবীন্দ্রনাথ নারীশিক্ষা বিস্তারের উপরও জোর দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন নারী-পুরুষ নির্বিশেষ শিক্ষা বিস্তারের মধ্যেই লুকিয়ে আছে শিকল ভাঙার মন্ত্র। কিন্তু এসব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের মতো একজন বড় মাপের সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ, নারী-পুরুষ সমানাধিকারের কথা বললেও নারী যে সকল দিক থেকে পুরুষের সমকক্ষ তা তিনি মানতে পারেননি। কারণ রবীন্দ্রনাথ যখন মানবতাবাদের চর্চা করছেন, তখন ইউরোপে মানবতাবাদের সেই শক্তিশালী ধারা আর নেই। সে তখন পুরনো সামন্ততান্ত্রিক অনেক চিন্তার সাথে আপোষ করছে। ভারতবর্ষেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সেই আপোষকামী মানবতাবাদী ধারার প্রতিনিধি। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই চিন্তাও শেষের দিকে এসে পরিবর্তিত হচ্ছিলো। বিশেষত তাঁর 'চিত্রাঙ্গদা' গীতিনাট্যে এটা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেখানে তিনি দেখান যে, মণিপুরের রাজা তার কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে ছেলের মতোই বড় করেন। ছেলেদের মতোই ধনুর্বিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা ও রাজকার্যনীতি শিক্ষা করান। চিত্রাঙ্গদাও এসকল পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন। এইক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুরনো চিন্তা ভেঙে নারী যে পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে অর্থাৎ একজন পুরুষ যা যা করতে পারে একজন নারীও তাই করতে পারে–তা এ গীতিনাট্যে তিনি দেখান।

আপোষকামী ধারার পাশাপাশি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে একটি আপোষহীন বিপ্লবাত্মক চিন্তাও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে গড়ে উঠতে শুরু করলো। এই আপোষহীন ধারার সাহিত্যিক ছিলেন শরৎচন্দ্র। কাব্যে কাজী নজরুল ইসলাম। একজন কবি বা সাহিত্যিক সবসময়েই বিপ্লবী বা সমসময়েই আপোষকামী–এরকম হন না। যেহেতু তিনি সমাজে বাস করেন এবং একজন বড় মানুষ হিসেবে সকলের কথাই ভাবেন–সেহেতু অনেক ধরনের চিন্তার প্রতিফলন তাদের সৃষ্টিকর্মে দেখা যায়। আমাদের বিচারটা করতে হয়

তাঁর মধ্যে কোন চিন্তাটা প্রধান এই প্রেক্ষিতে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল কিংবা শরৎচন্দ্র যাকেই আমরা মূল্যায়ন করি না কেন এই বিষয়টি আমাদের মাথায় রাখতে হবে। নজরুল তাঁর কাব্যে, গানে যখন দেশ নিয়ে, দেশের স্বাধীনতা নিয়ে, দেশের মানুষের উপরে প্রাচীন যত ধরনের নির্যাতন তার বিরুদ্ধে কথা বলছেন–তখন তিনি সংগ্রামী; কিন্তু তার পুরো জীবনটাই আপোষহীন সংগ্রামী ছিলো না। তাঁর চিন্তার মধ্যেও বহু ধর্মীয় চিন্তার প্রভাব জড়িয়ে ছিলো। কিন্তু মূলত তিনি ছিলেন আপোষহীন বিপ্লবী ধারার। নারীদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য নজরুল কাব্যে, গানে বিদ্রোহ ঝরিয়েছেন। অলঙ্কারকে শিকল আখ্যা দিয়ে নারীদেরকে তা ছুঁড়ে ফেলে দিতে বলেছেন। শরৎচন্দ্র ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দেশের মেয়েদেরকে স্বাধীন করা, জবরদস্তিমুক্ত করা যে কত দরকার সে সম্পর্কে বারবার বলে গেছেন। 'স্বরাজ সাধনায় নারী' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, ". . . যে জাতি যে পরিমাণে তার সংশয় ও অবিশ্বাস বর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, নারীর মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা যারা যে পরিমাণে মুক্ত করে দিয়েছে, - নিজেদের অধীনতা-শৃঙ্খলও তাদের তেমনি ঝরে গেছে। ইতিহাসের দিকে চেয়ে দেখ। পৃথিবীতে এমন একটা দেশ পাওয়া যাবে না যারা মেয়েদের মানুষ হবার স্বাধীনতা হরণ করেনি, অথচ, তাদের মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা অপর কোন প্রবল জাতি কেড়ে নিয়ে জোড় করে রাখতে পেরেছে।" শরৎচন্দ্র মনেই করতেন নারীদের স্বাধীনতা না আসলে দেশের স্বাধীনতা আসবেনা। কিন্তু আপোষহীন এ ধারাটি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারেনি। নেতৃত্ব দিয়েছে আপোষকামী ধারাটিই। ফলে সমস্ত ক্ষেত্রে নারী প্রশ্নে যে বৈষম্যের ভিত্তি সমাজে ছিলো, তাকে দূর করার জন্য, Equality ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণা থেকে অতীতের সমস্ত সামন্তীয় চিন্তা-ভাবনার বিরুদ্ধে আপোষহীন যে সংগ্রাম করার দরকার তার ছিলো–তা সে করতে পারলো না।

ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান নারীদের সম্পর্কে পিছিয়ে পড়া দৃষ্টিভঙ্গীকেই ধারণ করেছে

ধর্মের সাথে, সামন্তবাদের সাথে পুঁজিবাদের এই আপোষকামিতার কারণে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হলো। পাকিস্তান তৈরি হওয়ার মধ্য দিয়ে পুনরায় ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদের ঢেউ উঠলো অর্থাৎ যতটুকু ধর্ম তখন ছিলো তাকে আরো পাকাপোক্ত এবং শক্তিশালী করার জন্য আচরণে, চিন্তায়, সমস্ত সংস্কৃতির মধ্যে প্রবল ধর্মীয় প্রভাব নিয়ে আসা হলো।

পাকিস্তান আন্দোলনের পেছনে তখনকার মুসলিম পুঁজিপতিদের স্বার্থই প্রধান ছিলো। কিন্তু পাকিস্তান যে সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করেছে–সেটা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাই ছিলো। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার একটি নিজস্ব অর্থনৈতিক কার্যকলাপ আছে। অর্থনৈতিক কার্যকলাপ থাকলে তাকে পরিচালনা করার জন্য কিছু লোকেরও দরকার হয়। হিসেব-নিকেশ করার জন্য লোক দরকার হয়। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক যে দিকগুলো থাকে, সেগুলিকে কার্যকরী রাখার জন্য কিছু বিজ্ঞান চর্চা করা দরকার হয়। এসব ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের জন্য সে সময় ছেলেরাও যেমন এসেছিলো, তেমনি

মেয়েরাও এসেছে। কারণ জগৎ জীবনে মেয়েদের যে Supressed অবস্থা, সেখান থেকে বারে বারে মেয়েরা বিদ্রোহ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ঘরে ঘরে তারা যে কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আমাদের দেশে শিক্ষকতা বা বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত শিক্ষিত মানুষ যারা ছিলেন, তারা তখন মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কিছুটা অনুভব করছিলেন। বাস্তব জীবনের সংঘাত থেকেও মেয়েদের শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা develop করেছিলো। বাবা-মায়েরা দেখেছেন যে ভালো বিয়ে দিতে হলেও মেয়েদের কিছুটা মাত্রায় শিক্ষিত করা দরকার। তার জন্য সেসময়ে মেয়েরাও খানিকটা শিক্ষিত হয়েছে, দক্ষতা অর্জন করেছে।

কিন্তু সমগ্র সমাজের আমূল পরিবর্তন করার জন্য সাংস্কৃতিক-নৈতিক বিভিন্ন দিক থেকে যেভাবে মেয়েদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলা দরকার সেই সামাজিক আন্দোলন তখন পাকিস্তানে ছিলো না। থাকার কথাও নয়, সেই উদ্দেশ্যই তার ছিলো না। কিন্তু যখনই শিক্ষা আসে তখন ব্যক্তিগতভাবে কিছু কিছু চেষ্টাও তৈরি হয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শাসকদের প্রয়োজন ছিলো কিছু টেকনিক্যাল দক্ষতা অর্জন, কিন্তু শিক্ষার ব্যাপারটা যখন একবার এসে যায় তখন বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলি জানবার মতো পরিস্থিতিও আস্তে আস্তে এসে যায় অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ প্রবল চেষ্টার মাধ্যমে সে জায়গায় পৌছাতেও পারে। ফলে শিক্ষা গ্রহণের সবটাই শুধু শাসকদের ইচ্ছা ও চাহিদা অনুসারে চলেনি, উল্টো দিক থেকে কিছু সংগ্রামও তৈরি হয়েছিলো–এই কন্ডিশনগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে।

এদিকে পাকিস্তান সম্পর্কে মানুষের মোহও কাটতে শুরু করলো, আবার শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ বাড়তে থাকলো। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের মধ্যে তখন দেশপ্রেমের জোয়ার ওঠার কারণে সমাজের মধ্যে এর ছাপ পড়লো। যে কূপমণ্ডূকতা ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান তৈরি করেছিলো, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণি সেটা ভাঙতে শুরু করলো। অনেক মেয়েরাই উচ্চ শিক্ষায় আসতে লাগলো, সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে শুরু করলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। একটা ঘটনা মনে আছে, বললে বুঝতে পারবেন সেসময় অবস্থিত সমাজের রক্ষণশীল চিন্তার মধ্যে কীভাবে ভাঙন শুরু হয়েছিলো। অনার্স-মাস্টার্সে পড়ে এসকল ছাত্রীদের মধ্যে হঠাৎ টিপ পড়ার প্রচলন শুরু হয়ে গেলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো এর সূচনায়। এটা কিন্তু সাজার জন্য টিপ পড়া নয়, প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে Defy করার জন্য এই টিপ পড়া। অর্থাৎ 'দাবিয়ে রাখতে চাও তো, মানবো না, কি করলে আমাকে ভাল দেখায় তা আমি নিজেই ঠিক করে নেবো।' এটা এখানেই থামেনি। গোটা পাকিস্তান পর্বে মেয়েরা রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছে, পুলিশের সাথে লড়েছে, মিলিটারির সাথে লড়েছে, সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছে, ছাত্র সংসদ নির্বাচন করেছে ও জিতেছে, মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে ঢাকার রাস্তায় ডামি রাইফেল নিয়ে মহড়া পর্যন্ত দিয়েছেন এবং গোটা মুক্তিযুদ্ধ পর্বে মেয়েরা সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়েছে, লড়াই করেছে।

ফলে পাকিস্তান বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ঘরের মেয়েদের ঘর থেকে বাইরে বের করেছিলো। পাকিস্তান মেয়েদের সম্পর্কে যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পিছিয়ে পড়া দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এসেছিলো-পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন ও শিক্ষিত মেয়েদের এই লড়াই সেটাকে ব্রেক করতে চেয়েছে, কিছুটা পেরেছেও। কিন্তু সমগ্র জাতির মধ্যে নারী সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে গিয়েছিলো বা যে শিক্ষিত ঘরের মেয়েরা সেদিন একটা উত্তাল সময়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলো, সেই শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে নারী সম্পর্কিত চিন্তার ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছিলো-এমনটা কিন্তু সেদিন ঘটেনি। এরও একটা কারণ আছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আপোষকামী বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বে হওয়ায় পুরনো ধ্যান-ধারণার সাথে সে আপোষ করেই চলেছে

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম যে দলের, আরও স্পষ্ট করে বললে যে শ্রেণির নেতৃত্বে হয়েছে, সে পাকিস্তান জাতীয়তাবাদের সবকিছুর সাথে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগ্রাম করে, বুর্জোয়া অর্থেই, বুর্জোয়া মানবতাবাদী আদর্শের উন্নত রূপকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে, তা কিন্তু নয়। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে যে দুর্বলতা ছিলো, বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবাদী চিন্তা তখন গড়ে উঠছিলো তার মধ্যেও সেই একই দুর্বলতা থেকে গিয়েছিলো। নেতৃত্বদানকারী বুর্জোয়া শ্রেণি পাকিস্তান জাতীয়তাবাদী চিন্তাসমূহের সাথে আপোষরফার মধ্য দিয়েই চললো। আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিলো কিন্তু দারুণভাবে। যদিও অর্থনৈতিক শোষণ-বৈষম্য ও তাকে কেন্দ্র করে প্রচণ্ড ক্ষোভ ভিত্তি হিসেবে ছিলো, কিন্তু ভাষাকে কেন্দ্র করে একেবারে একটা সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হলো। প্রভাতফেরি, শহীদ মিনার নির্মাণ করা ও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা–এই চিন্তাগুলো পাকিস্তানের সাথে একেবারে যায় না। কিন্তু বিদ্রোহের সূচনাতেই এগুলো এসে গেলো। অথচ দুঃখের বিষয় এই যে, এভাবে শুরু হওয়ার পরও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সেই ঝাণ্ডাটি নেতৃত্বদানকারী বুর্জোয়াশ্রেণি আর ধরে রাখলো না। কারণ বিশ্বপুঁজিবাদের ক্ষয়িষ্ণু দশায় এদেশে পুঁজিবাদের অভ্যুত্থান। সে কারণে সে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্ত ক্ষেত্রে সামন্তবাদের সকল রকম প্রভাব কাটানোর জন্য প্রবল লড়াই করেনি। ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতা, কুসংস্কার, নারীদের সম্পর্কে পিছিয়ে পড়া দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি যেগুলোকে পাকিস্তানভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির জন্য ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরির কাজে তখনকার মুসলমান পুঁজিপতিশ্রেণি ব্যবহার করেছিলো, সেগুলোকে সমস্ত দিক থেকে পরাস্ত করে নতুন জাতি গঠন করতে তারা চায়নি। একদিকে বিশ্ব পুঁজিবাদ ক্ষয়িষ্ণু, অপরদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীতে বিশ্বজুড়ে সমাজতন্ত্রের যে জয়জয়কার চলছিলো, তার ঢেউ এসে এদেশের বুকেও লেগেছিলো। সর্বহারাশ্রেণি বিপ্লবের ভীতিও এদেশের উঠতি বুর্জোয়াদের মনের মধ্যে কাজ করছিলো। তাই সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা বুর্জোয়ারা তুলবে না–এটাই স্বাভাবিক। সে সময়ে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ নিয়ে যারা চলতেন, যাদের বিরাট প্রভাব-

প্রতিপত্তিও ছিলো, তারা যদি মার্কসবাদী রাজনীতি সঠিকভাবে বুঝে স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে পারতেন, তবে ইতিহাস ভিন্ন হতো। কিন্তু তারা তা পারেননি। একটা সময় পর্যন্ত বুঝতেও পারেননি যে দেশ স্বাধীন হওয়ার দিকে যাচ্ছে। সেটা ইতিহাসের আরেক প্রসঙ্গ। সে আলোচনায় আমি যাচ্ছি না।

ফলে এক ধরনের আধাখেঁচড়া অবস্থায় এখানে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হলো। তাই দেখা যায় এদেশে এখনও সামন্তীয় সামাজিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় ব্যবস্থা এদেশের মানুষের সমগ্র মননের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে আছে। নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তারা সামন্তীয় সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। বুর্জোয়া অর্থেও যে পরিবার আমাদের এখানে গড়ে উঠেছে, সেই পরিবারে শিক্ষা-দীক্ষা এসেছে, কিছু ব্যবহারিক পরিবর্তন হয়েছে। পোশাকে-চলনে-বাচনে আধুনিকতা এসেছে। কিন্তু ভেতরে, মননে তার মধ্যে সামন্ত সংস্কৃতি এখনও জড়িয়ে আছে। স্বামী সম্পর্কে স্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গী, স্ত্রী সম্পর্কে স্বামীর দৃষ্টিভঙ্গী, ভাই-বোন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী, আত্মীয় সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী–এগুলির মধ্যে, একটা আধুনিক মানুষের যে দৃষ্টিভঙ্গী থাকে, সেই দৃষ্টিভঙ্গী সামাজিকভাবে গড়ে ওঠেনি। একটা নতুন ধরনের দেখার চোখ, ভাবার মন সামাজিকভাবে আসেনি।

পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনের সময় দেশের মানুষেরা শাসকগোষ্ঠীর একেবারে স্থূল জবরদস্তি অর্থাৎ অর্থনৈতিক জবরদস্তি, শিক্ষাও স্বাস্থ্যের অধিকার থেকে বঞ্চনা–এসবের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। কিন্তু যে সমাজব্যবস্থার মধ্যে তারা আছে, সেখানকার পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিংবা নিজেদের মানসিক জগতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন তারা ঘটাতে পারেনি। ফলে ধর্মীয় কূপমণ্ডূক চিন্তার প্রবল প্রভাব আমাদের জনগণের মধ্যে এখনও আছে। ফলে নারী সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে তার ছাপও রয়ে গেলো। আবার এও ঠিক, বাস্তব অবস্থার সাথে এর দ্বন্দ্বও আছে। পুঁজিবাদের কারণে নারী কর্মজীবনে প্রবেশ করেছে ঠিকই কিন্তু পুরনো সেই দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে তাকে সমাজ মানতেও পারছে না। ফলে নারীর উপর স্বাভাবিকভাবে সামাজিক-অর্থনৈতিক-মানসিক ও যৌন নির্যাতন বাড়ছে প্রতিদিন।

বর্তমান সমাজে বন্ধ্যাত্ব যেমন আছে, তেমনি সবরকম শৃঙ্খল থেকে নারীর মুক্ত হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষাও আছে

বর্তমান সময়ে এদেশের নারীরা কেমন আছে? খুব দুঃখে আছে, কষ্টে আছে। কিন্তু সমাজ আর আগের জায়গায় নেই–এও ঠিক। আজ থেকে একশত বছর আগে একজন নারীর তার স্বামীকে মান্য করার যে মন ছিলো আজ তা নেই। নেই এই কারণে যে, তার জীবনে স্বাতন্ত্র্যের ভাবনা এসেছে, মানবিকতার স্পর্শ এসেছে, অনেক রকমের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনেক অপমান থেকে মুক্ত হয়ে সবকিছুকে অর্জন করার মন তার মধ্যে Develop করেছে। এই প্রবল মানসিক সংকটের মধ্যে আছে আমাদের মেয়েরা। এমনকি গ্রামের মেয়েরাও এই সংকটের মধ্যে আছে। জগৎ তো আর কারও হাতের মুঠোর মধ্যে নেই। মেয়েদের চোখও তো আর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে নেই। তারা

দেখতে পাচ্ছে রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, প্রযুক্তির আরও নানা ধরনের ব্যবহার- সবকিছুর সংস্পর্শেই মেয়েরা আসছে। ফলে নিজেকে সব রকমভাবে বিকশিত করার মন তাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে। প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সাথে, তার পরিচালনার নিয়ম-কানুনের সাথে সেটা দ্বন্দ্বও তৈরি করছে।

ফলে এই যে জীবন, এই যে সমাজব্যবস্থা–তার মধ্যে এক প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব চলছে। প্রচণ্ড কষ্টের মধ্য দিয়ে এই সমাজ পরিচালিত হচ্ছে। সত্যিকারের আনন্দের, মর্যাদার, মানবিকতার খোঁজ এই সমাজে নেই, নর-নারী সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নেই। বড় করে দেখবার মতো দৃষ্টিভঙ্গী নেই। সামাজিক ব্যবস্থায় মানুষের মননে এরকম একটা বন্ধ্যা দশা চলছে। মুক্তিযন্ত্রণায় কাঁপছে গোটা সমাজ। এই অবস্থা যদি সঠিক হয়, তাহলে যারা নারীমুক্তির আন্দোলন করবে তাদের জন্য এটি বিরাট একটি ক্ষেত্র।

যে সকল জায়গায় আপনারা কাজ করেন, সেখানে মানুষের অবস্থা আপনারা নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন। মানুষ এখন বাস্তবে সুখ-স্বস্তি-শান্তি-ভালোবাসা হারানো মানুষ। আর্থ-সামাজিক দিক থেকে যে ব্যবস্থা এখানে বিদ্যমান তাকে বিশ্লেষণ করে আমরা এই দেশটাকে, তার সমাজব্যবস্থাটাকে একটা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা বলে মনে করি। পুঁজিবাদের সর্বাত্মক আক্রমণে এদেশ ক্রমাগত বিধ্বস্ত এবং পুঁজিবাদের দ্বারা নৃশংস-নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত। এই হলো আমাদের সমাজ। এই সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া কোনোভাবেই কারো মুক্তি নেই। এই মুক্তির লড়াইয়ে ছেলে ও মেয়ে সবাইকেই পাশাপাশি থেকে লড়তে হবে। কিন্তু মেয়েদের ওপর যে অত্যাচারটা হচ্ছে সেটি পুরোনো সামন্তীয় অত্যাচার। যদিও ব্যক্তিস্বাধীনতার সামাজিক ব্যবস্থা আংশিকভাবে হলেও সমাজের অভ্যন্তরে এসেছে। তাই তুলনামূলক একই পুঁজিবাাদী সমাজে থেকেও মেয়েদের ওপর নিপীড়ন ছেলেদের তুলনায় বেশি। তাই মেয়েদের সংগ্রামটা ছেলেদের তুলনায় অধিক কষ্টকরও।

অর্থনৈতিক কষ্টকে মানুষ অর্থনৈতিকভাবে মোকাবেলার চেষ্টা করে,
কিন্তু সাংস্কৃতিক সংকট তাকে দিশেহারা করে দেয়

ঘরে ঘরে মানুষের মধ্যে কষ্ট বাড়ছে। যে যা চাইছে, সে তা পাচ্ছে না। কেন পাচ্ছে না? এত কষ্ট কেন? কীভাবে এত কষ্টের জন্ম হচ্ছে সমাজে? এগুলি উদ্‌ঘাটন করে দেখানো হলো আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি। আমি আগেই বলেছি শুধু নারী আন্দোলন নারীদের মুক্তি দিতে পারে না। নারীদের পূর্ণ মুক্তির জন্য সামাজিক আন্দোলন দরকার, সমাজ পরিবর্তন করা দরকার। আমাদের মেয়েরা ও ছেলেরা সমাজের এই প্রবল প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে। লড়াই করবে। এই করতে গিয়ে, একটা নতুন ধরণের সংগ্রাম করতে গিয়ে, সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে গিয়ে, বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সম্মিলিত সমষ্টিগত স্বার্থ প্রতিষ্ঠার ও সমষ্টিগত স্বার্থেও সামাজিক ব্যবস্থা আনার যে সংগ্রাম–সেটা করতে করতে, সেই সংগ্রামকে কেন্দ্র করে আমাদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হবে। এই সম্পর্ক সমাজে প্রচলিত পিছিয়ে পড়া সম্পর্ক থেকে উন্নত। আবার মেয়েদেরও মনে

রাখতে হবে, যে সাংস্কৃতিক নির্যাতন তাদের উপরে নানাভাবে হয়েছে, সেসব থেকে মুক্ত হয়ে সমাজের সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে, চরিত্র হিসেবে আসতে হলে তাদের নিজেদের এই সংগ্রাম সঠিকভাবে করতে হবে। আমরা একটা নতুন ধরনের সামাজিক ব্যবস্থা আনতে চাই, সেই নতুন সমাজের নতুন চিন্তার সাথে যুক্ত করে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করতে হবে। এই পারস্পরিক সম্পর্ক হবে সকল প্রকার ব্যক্তিস্বার্থ থেকে মুক্ত, সকল প্রকার সম্পত্তিজাত মানসিকতা থেকে মুক্ত। এরকম একটা সম্পর্ক আমরা নিজেদের মধ্যে স্থাপনের মধ্য দিয়ে, সেই চরিত্র ধারণ করে আবার সেই চরিত্র আনবার সংগ্রামের অংশ হিসেবে যখন জনগণের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছি, সেটাই তখন মানুষের মধ্যে নতুন করে একটা আদর্শের ধারণা তৈরি করে।

এই আদর্শ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেঁচে থাকতে হলে আদর্শ লাগে। আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণা এসেছে। এই ধারণায় সমাজের মধ্যে নারী-পুরুষ দু'জন মানুষ, নারীও একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, পুরুষও একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। অথচ দেখা যাচ্ছে যে, এই ব্যবস্থার মধ্যে বেঁচে থাকতে গিয়ে তারা আদর্শ হারিয়ে ফেলছে। ধর্ম আগের মতো তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে নেই। আবার আধুনিক নীতি-নৈতিকতা-মূল্যবোধও তাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। তাহলে এই অবস্থায় তারা কীভাবে বেঁচে আছে? কেন আছে? যখন আছে, তখন তারা কিন্তু মুহুর্মুহু ব্যক্তিগত স্বার্থকেন্দ্রিক নানা ধরনের সংকটে জর্জরিত মানুষ হিসেবে বেঁচে আছে। উপায়হীন টিকে থাকছে, জীবন ধারণ করছে। এই ধরনের একটা পরিবেশের মধ্যে আমরা আছি।

মনে রাখবেন, আদর্শহীন অবস্থার জন্য মানুষ কষ্ট পাচ্ছে। কষ্ট সব সময় বৈষয়িক নয়। বৈষয়িক কষ্টও মানুষের হয়, কিন্তু যখন একটা বৈষয়িক কষ্ট, অর্থনৈতিক কষ্ট মানুষের সামনে আসে, তখন মানুষ সেটাকে অর্থনৈতিকভাবে মোকাবেলা করার চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষের সংকট যখন সাংস্কৃতিক সংকট, এর কষ্ট তখন মানুষকে সবচেয়ে বেশি দিশেহারা করে। কারণ এই সংকট সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী মানুষের সঙ্গে বসবাস করতে গিয়েই হয়।

তাহলে আমাদের সংগঠকদের দেখতে হবে, আমরা বর্তমান সমাজে যে ধরনের নর-নারী সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছি, আমাদের সম্পর্ক কি সেই রকমের? নাকি আমরা এমন কিছু স্বতন্ত্র ধরণের মানবিকতার চর্চা করি, স্নেহ-ভালোবাসার চর্চা করি–যার মধ্যে এই সমাজের মানুষেরা নিঃস্বার্থ সামাজিক প্রয়োজনকে উৎসর্গ করতে পারার মতো চারিত্রিক মান দেখতে পায়। এই চারিত্রিক মান দেখে মানুষ নতুন একটা আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই প্রশ্নগুলি বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আদর্শের প্রতি নিবেদিত নারী-পুরুষের সম্পর্ক তার নিজস্ব সৌন্দর্যে মানুষকে টানবে

নারীমুক্তির কর্মীদের আদর্শের প্রতি নিবেদিত হয়ে গড়ে উঠবার জন্য প্রবল আকুতি থাকা উচিত। সংগঠন গড়ে তোলার জন্য সংগ্রামের প্রয়োজনে আমাদের Working Relation-এর মধ্যে, পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে অতীতের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা

থেকে বা শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা আসার পর থেকে ব্যক্তির যে বহু রকমের জটিল মানসিকতা বা অহম এসেছে–তা থেকে মুক্ত হতে হবে। অহম থেকে মুক্ত না হলে সম্পত্তিজাত মানসিকতা থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না। সম্পত্তিজাত মানসিকতা থেকে মুক্ত না হলে একজন সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ে নিয়োজিত কর্মীর মতো ভালোবাসা যাবে না। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব-ভালোবাসা-মমতার চর্চা করা যাবে না। আমরাও যদি সমাজব্যবস্থার মধ্যে প্রচলিত স্বার্থবোধগুলিকে ধারণ করেই আমাদের মধ্যেকার সম্পর্ক পরিচালনা করি, তাহলে কিন্তু আমরা বিপ্লবী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার মতো উপযুক্ত মানুষ হয়ে উঠতে পারবো না। আমাদেরকে সকল রকম ব্যক্তিস্বার্থ থেকে মুক্ত হতে হবে। সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের কর্মীরা যখন একে অপরের সাথে সম্পর্কিত হবেন, সেই সম্পর্কের মধ্যে যে স্নেহ-ভালোবাসার চর্চা করবেন, তার রূপ কী? সেটা কি আমাদের সকল কর্মীদের প্রতি ভালোবাসারই বিশেষীকৃত রূপ? সমস্ত মানুষকে যে ভালোবাসি, সেই ভালোবাসাই একটা বিশেষীকৃত রূপে দু'জনের মধ্যে যে সম্পর্ক, সেই সর্ম্পকের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে কী? এর মানেই হলো আমাদের সম্পর্কের মধ্যে এমন কোনো গোপনীয়তা নেই, যা সমস্ত কমরেডদের জন্য আমাদের প্রত্যেকের যে দায়বদ্ধতা, সেই দায়বদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারে। ছেলেরা-ছেলেরা যে ভালোবাসে, মেয়েরা-মেয়েরা যে ভালোবাসে, নারী-পুরুষের যে ভালোবাসা, সমস্ত ভালোবাসার মধ্যে যে বিষয়টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ–সেটা হলো সম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বার্থমুক্ত ভালোবাসা হচ্ছে কিনা।

মনে রাখবেন, আমরা এই সমাজেরই মানুষ। এখান থেকে অনেক ভালো জিনিস আমরা গ্রহণ করেছি, আবার সবচেয়ে খারাপ জিনিসগুলিও তো কাজ করতে গিয়ে, চলতে গিয়ে, জনগণের মধ্যে থেকে আমরা পাচ্ছি। এই জনগণকে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা কত রকম ভাবেই না লাঞ্ছিত-অপমানিত করছে। তার নানা রকম বিকৃতির সংস্পর্শে তো আমরাও আসছি। ফলে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, তার থেকে মুক্ত থাকার সংগ্রামটা আমরা প্রতিদিন পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে রাখছি কিনা। পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে উচ্চ নৈতিকতার চর্চা করার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে আছে কিনা। এইভাবে ক্রমাগত এই সংগ্রাম থেকে আমাদের মধ্যে সমষ্টির স্বার্থ গড়ে উঠবে, সমষ্টির নৈতিকতা গড়ে উঠবে।

যে মানুষটা আমাকে ভালোবাসে সে আমাকে যেকোনো কথা বলতে পারে না। এতো ক্ষমতা তার ভালোবাসার নেই যে, সামাজিক আন্দোলনে লড়াই এর জন্য আমার চরিত্রের যে দৃঢ়তা ও বিশ্বাস–সেটাকে সে নষ্ট করতে পারে। সে ক্ষমতা সে রাখে না। আমি এই রকম বোধসম্পন্ন। উল্টোদিক থেকে সে মানুষটাও তাই। এই রকম করে যদি আপনারা গড়ে উঠতে পারেন তাহলে আমি মনে করি, নিজেদের অভ্যন্তরে আপনারা চরিত্র শক্তির একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করতে পারবেন। এই নৈতিকতা ছাড়া, এই মূল্যবোধ ছাড়া, এই উচ্চ মানবিকতা ছাড়া সংগঠনকে আদর্শগত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে পারবেন না। এই আদর্শকে দাঁড় করাতে হবে সকল রকমের

ব্যক্তিস্বার্থ থেকে মুক্ত হয়ে। যেখানে যেখানে ব্যক্তিস্বার্থপরতা আছে, যেখানে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমাদের চিন্তায়, মননে যেখানেই এই ব্যক্তিস্বার্থপরতার সামান্যতম উপাদান আছে–তার থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রাম আপনাদেরকে করতে হবে।

আমরা ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে যে সকল কথার চর্চা করি, সেটা যাতে সকলের সামনে বলতে পারি-এই ধরনের চর্চা আমরা করি। আমাদের ভালোবাসার একান্ততার একটা রূপ থাকতে পারে। কিন্তু ভালোবাসার যত রকমের সৌন্দর্য, যত তার শৈলী–সে তো সবার জন্য। একজন সাহিত্যিক যদি ভালবাসার সৌন্দর্য সৃষ্টি করে চরিত্র নির্মাণ করতে পারেন, মান-অভিমান তৈরি করতে জানেন, তার রূপ রস সৃষ্টি করতে জানেন–তাহলে আপনারা সমাজের এই পরিবর্তনের শিল্পী হিসেবে পারস্পরিক সম্পর্কের সৌন্দর্য তৈরি করতে জানবেন না কেন? যদি না জানেন, তাহলে কোন ধরনের জড়তাগুলির জন্য তা করতে পারেন না তা ভেবে দেখুন। ছেলেদের তা বেশি করে ভেবে দেখা দরকার। সব জড়তার পিছনে চিন্তা আছে। আমাদের মধ্যে অনেক রকমের সাবলীলতার ঘাটতি আছে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বাধীন ও মুক্ত মানুষ হিসেবে অবস্থানের অভাব আছে। আবার এই অভাব আছে মানে তার পেছনে চিন্তা আছে। সেই চিন্তাগুলি কি শ্রেণি চিন্তার বাইরে? শ্রেণি বিভক্ত সমাজের সকল চিন্তাই কোনো না কোনো শ্রেণির চিন্তা, কোনো না কোনো শ্রেণির স্বার্থকে সে প্রতিফলিত করে। নারীমুক্তির প্রশ্নে সংগঠনের অভ্যন্তরের এসকল সাংস্কৃতিক সংগ্রাম খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আদর্শের প্রতি নিবেদিত নারীদের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী কী হবে

আমাদের সমাজে মেয়েরা পিছিয়ে আছে। সামাজিক অন্যায়ের কারণে মেয়েরা হাজার হাজার বছর ধরে পিছিয়ে আছে। মেয়েদেরকে জবরদস্তি করে এ অবস্থায়-রাখা হয়েছে, সেজন্য এখনও তারা পিছিয়ে আছে। আবার তার মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে বহু নারী তাদের নিজস্ব লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ছেলেদের তুলনায় এগিয়ে আছে। আমি Individual কোনো মেয়ের কথা বলছি না, সাধারণভাবে মেয়েদের কথা বলছি। সাধারণভাবে মেয়েরা পিছিয়ে আছে। সমস্ত পিছিয়ে থাকা মানুষকে সহায়তা করাই হলো বিপ্লবীদের, বড় মানুষদের, বড় চরিত্রের কাজ। এই রকম মনোভাব কি আমাদের ছেলেরা মেয়েদের সম্পর্কে ধারণ করে?

আমরা যারা এই বিপ্লবী রাজনীতিতে ঘটনাক্রমে নেতৃত্বে আছি, আমরা কিন্তু এই সমাজেরই মানুষ এবং আমাদের কর্মী-সংগঠক-নেতা সবাই তাই। এই সমাজব্যবস্থার যে পরিবেশ তা সবসময়ই আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। এখানে সর্বোচ্চ নেতা থেকে কর্মী-সংগঠক পর্যন্ত সবাইকে যার যার স্তর থেকে সতর্ক ও সচেতন সংগ্রাম করতে হবে। আমরা সর্বহারা শ্রেণির চিন্তা গ্রহণ করে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করার সংগ্রামে আছি। খেয়াল রাখবেন, বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার মধ্যে আমাদের জীবনধারণের ক্ষেত্রে, আমাদের অভ্যাস-আচরণ-রুচি-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে বুর্জোয়াদের প্রভাব অজান্তে অনেকভাবে আছে। এসব কিন্তু বিশাল প্রভাব, এরই মধ্যে আমরা বসবাস করি। সেজন্যে আমাদের যে আদর্শ সেটাকে

কত সতর্কভাবে, কত যত্নে, কত নিবিড়ভাবে ধারণ করে তার অনুশীলন করতে পারি–সে প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই আদর্শ আমাদের কাছে যুক্তি হিসেবে আছে। এটাকে জীবনে ধারণ করতে হলে অনুশীলন ভিন্ন কোনো উপায় নেই। নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আমরা এই আদর্শের পরিপূরক মানুষ হয়ে উঠতে থাকি। আমরা এই আদর্শের খবর পাওয়া মাত্রই এই আদর্শের লোক হয়ে গেছি, এর বইগুলি পড়ে ফেললেই, অর্থাৎ এর যুক্তিগুলি জেনে ফেললেই, অমনি করে আমরা আদর্শটা গ্রহণ করে ফেলেছি, কথাটি এই রকম নয়। আদর্শকে জীবনে গ্রহণ করে নিবিড় এবং অত্যন্ত সতর্কভাবে, পরম যত্নে এর পক্ষে ক্রিয়া করা দরকার।

আমি দলের নেতা-কর্মীদের বলি, যেখানে নিজেরই হাত বাড়িয়ে সাহায্য করা দরকার, সেখানে সাহায্য করাই কাজ। মেয়েদের কাজ বলে কিছু নেই। মেয়েদের মধ্যে কাজ করার একটা ফর্ম আছে, যেমন এই সংগঠন। কিন্তু যে কাজটা করা হচ্ছে সেটা তো বিপ্লবের কাজ, সেজন্য যত রকমভাবে সহায়তা করা যায়, যত রকমভাবে হাত বাড়ানো যায়, সব রকমের সহায়তা করা দরকার। এক হচ্ছে, দলের অভ্যন্তরে মেয়েরা সংখ্যায় কম। এটাও একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। সংখ্যায় তারা কম কেন? সেটার জন্য কি আমরা দায়ী নই? আমি প্রশ্নটা আগেও কর্মীদের করেছি–মেয়েদের টানতে পারছেন না কেন? কারণ এমন একটি সাংস্কৃতিক আকর্ষণ আপনি এখনো তৈরি করতে পারেননি যে মেয়েরা আপনাকে দেখলে এগিয়ে এসে কথা বলবে। মেয়েরা সমাজে নানাভাবে অপমানিত-লাঞ্ছিত হচ্ছে, আপনাদের দেখে, আপনাদের উপর আস্থা রেখে, আপনাদের সংস্কৃতি দেখে তারা বুঝবে যে আপনারা ভিন্ন ধরনের মানুষ। আপনারা মেয়েদেরকে সম্মান-শ্রদ্ধা করতে জানেন। তখনই শুধু নানা স্তরের মেয়েরা আপনাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। ধরুন, আপনি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছেন, মেয়েদেরকে দেখলে সম্মান করছেন। আপনার ব্যবহারে যদি থাকে যে আপনি সম্মান করছেন, তাকে কেয়ার করছেন, তাদেরকে বিকশিত হওয়ার জন্য সহযোগিতা করছেন, বাঁধা দিচ্ছেন না, সমস্ত ক্ষেত্রে তাকে চলতে সহায়তা করছেন–এসব জিনিস মেয়েরা লক্ষ্য করে। এরকম সম্মান করেই একজন মেয়েকে, এমনকি যে মেয়ে কারও সাথে কথা বলতে চাইতো না–তার উপরও চরিত্রের প্রভাব ফেলতে পারবেন। তারপর আপনি তার সাথে কথা বলার সুযোগ তৈরি করতে পারেন। ব্যক্তিগত কারণের জন্য একজন ছেলের একজন মেয়ের সাথে পরিচিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আসে। সামাজিক-নৈতিক এরকম মহান বিপ্লবী যে প্রয়োজন তার জন্য আসবে না কেন? সমস্ত আকর্ষণীয় ছেলেদের; আকর্ষণীয় কথাটি আমি অন্য কোনো অর্থে বলিনি, গুণে যে আকর্ষণীয় মানুষ, সেই মানুষের এ ক্ষমতা থাকতে হবে। বয়স্কা নারীরাও আপনাদের পছন্দ করবে। যে এলাকার মধ্যে থাকি, সেখানের গৃহস্থ নারীরা আমাদের পছন্দ করে, ভালোবাসে। বুঝে যে এরা ভিন্ন ধরনের, এদের থেকে কোনো রকম অপমানের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সব ধরনের শ্রদ্ধা সম্মান তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। এরা নিরাপত্তা দিতে পারে। এই রকম সম্পর্ক তো আমাদের সমস্ত মানুষদের সাথে তৈরি করতে হবে। আপনারা অভ্যাস করলে, এটা চর্চা

করলে, আপনাদের মাধ্যমে অনেক মেয়েরা আমাদের দলের সাথে আসবে। আমি দলে মেয়েদের টানবার ক্ষেত্রে কথাটা বলছি। মেয়েদেরকে কিন্তু আরো ব্যাপকভাবে এইখানে আনবার মতো ক্ষমতা আমাদের বিপ্লবী কর্মীদের অর্জন করা দরকার। কারণ বিপ্লবী লড়াইয়ে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছাড়া সত্যিকার অর্থে উন্নত নৈতিক-সাংস্কৃতিক মান গড়ে উঠবে না। বিপ্লবী লড়াইয়ে প্রত্যেকটি নেতা-কর্মীর সেই উন্নত নৈতিক-সাংস্কৃতিক মান গড়ে তোলার লক্ষ্যে বেশি সংখ্যক মেয়েদের সংগঠনে যুক্ত করা প্রয়োজন। নর-নারীর পারস্পারিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনে গতির সঞ্চার হবে। কারণ সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীকে অন্ধকারে রেখে সমাজের বড় কোনো পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো–একটি উন্নত সাংস্কৃতিক লড়াই গড়ে তোলার জন্য, সংস্কারমুক্ত মনন তৈরি করার জন্য, একটা মুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশ নির্মাণের জন্য বিপ্লবী আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজন।

অর্থাৎ একটা মুক্ত পরিবেশ সমাজে আনতে গেলে আমাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্পর্শে এসে, আমাদের চরিত্র দেখে, আমাদের সাংস্কৃতিক প্রভাবে যে আকর্ষণ তাদের মধ্যে তৈরি হয়–এর মাধ্যমে আমরা একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারি। আমরা কোনো এলাকায় অবস্থান করছি মানেই হলো- সেখানকার বাচ্চাদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব আছে। কোনো বাচ্চা পাড়ায় নেই যার সাথে আমি একটু ভাব রাখছি না, একটু কথা বলছি না, ঠাট্টা করছি না। কোনো না কোনো ভাবে তার সাথে কানেকটেড হচ্ছি না। যে ভাবেই হোক সম্পর্কটা তৈরি করছি। মিষ্টি কথায় হোক, খেলাধুলায় হোক, কোনো না কোনো ভাবে আমি তাদের সাথে আছি। তাদের নিয়ে খেলতে পারি, নাটক তৈরি করতে পারি, লাইব্রেরি করতে পারি। জমিয়ে রাখতে পারি তাদের। এতে কী হয়, আমি বাচ্চাদের সাথে এরকম একটা সুন্দর সম্পর্ক স্থাপন করলে তা আমার চরিত্রেও প্রভাব ফেলে। এখন সমাজে এসব জিনিস বেশি নেই। নষ্ট করে দেবার প্রবণতা বেশি। সেখানে আমরা ভিন্ন। বাচ্চাদের নিয়ে বিভিন্ন আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে। এগুলি করতে পারার মধ্য দিয়ে আদর্শকে বোঝাতে হবে। মেয়েরা কাজ করতে যখন যায় তখন তো কত বাচ্চাদের পায়। আপনারা যে বস্তি বাড়িতে কাজ করতে যান, আপনাদের একটা বদ্ধপরিকর চিন্তা মনের মধ্যে হয়তো কাজ করে, সে কারণে শুধু নারীদের কাছেই যান। বাচ্চাদের সাথে, কম বয়সীদের সাথে মেলামেশা কম করেন। এটা ঠিক নয়।

নারীরা যারা এখানে এসেছেন সংগঠন গড়ে তোলা নিয়ে দুটো কথা শোনার জন্য, তাদের বলছি। আপনারা কোথাও গেলে শুধু একদিকেই পড়ে থাকবেন না। শুধু যে মেয়েটির সাথে দেখা করতে গেলেন, তার সাথে কথা বলেই ফিরে আসবেন না। অনেকে বলবেন, সবার সাথেই তো আলাপ করতে চাই, কিন্তু সময় তো থাকে না। সময় না থাকলে তো মুশকিল। সময় নেই, তাহলে কী নিয়ে আপনার সময় কাটে? দুঃখ নিয়েই ব্যস্ত থাকার কারণেই সময় নেই আপনার। আনন্দ নিয়ে সময় কাটানোর

মতো তো সামাজিক অবস্থা নেই। আপনার কোন জীবন আছে? যাদের সময় নেই, তাদের কী নিয়ে সময় কাটছে? দুঃখ নিয়েই সময় কাটছে। বাচ্চা সামলাতে ও স্বামী সামলাতেই সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফলাফলে তো দেখা যাচ্ছে যে, অল্প বয়সে বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন। মানবজন্ম কি এভাবেই ব্যর্থ হবে নাকি? কিছুই কি করার ছিলো না? স্বাধীন মানুষও তো হতে পারলেন না। একেবারে কুঁকড়ে গেলেন। তাতে ভালো কাটছে সবসময়? শক্তিতে দাঁড়ান। মেয়েদের শক্তিতে দাঁড়ানো মানে কি ছেলেদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক লড়াই শুরু হয়ে যাওয়া? এটা তো আসলে মর্যাদা অর্জন। মর্যাদার ভিত্তিতে মানবিক সম্পর্ক স্থাপন করা। এই লড়াই মানে, কোনো দিনই কারো মর্যাদা হরণ করা নয়।

নারীদের একটি স্বতন্ত্র সংগঠন দরকার

মেয়েদের একটা বিশেষ ধরনের সংগ্রাম হলো এই সংগঠনটা গড়ে তোলার সংগ্রাম। কারণ, এই সংগঠনে অন্য মেয়েরা যেন স্বাভাবিক সাবলীলভাবে এখানে এসে যোগ দিতে পারে। সমাজে মেয়েদের উপর এত অনাচার-অত্যাচার চলছে, ফলে মেয়েদের একটা স্বতন্ত্র সংগঠন দরকার। এই সংগঠনের পতাকাতলে মেয়েরা তাদের অধিকারগুলি নিয়ে লড়াই করবে, আন্দোলন গড়ে তুলবে। সেজন্য কতগুলো পরিকল্পিত সামাজিক অধিকার অর্জনের জন্য আপনারা এখানে আইন নিয়ে কর্মশালা করছেন। আবার কিছু সামাজিক আইন আছে যা মেয়েদের অধিকার হরণ করে। এসব নিয়ে আপনারা আলোচনা করছেন। নারীর আইনগত অধিকার কী আছে, কী নেই তা আগে যতটুকু জানতেন, এসব করার মধ্য দিয়ে সে ধারণা আরও খানিকটা উন্নত হচ্ছে। দেখছেন, বুঝছেন, ভাবছেন–এখন যা নেই তার জন্য কীভাবে সংগ্রাম করবেন, লড়াই করবেন–এসবকিছু স্থির করে আপনাদের আরও বড় সংগ্রামের দিকে যাওয়া উচিত। এর প্রস্তুতির জন্য নিশ্চয় আপনারা একাজ করছেন। ভালো জিনিস। কিন্তু আমি বলছি যে, এই শিক্ষাসমূহের উদ্দেশ্য কী? লক্ষ্য কী? লক্ষ্য হলো মেয়েদের আন্দোলন গড়ে তোলা। মেয়েদের আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে মেয়েদের কাছে যাওয়া, মেয়েদের কাছে পৌঁছানো, যত ধরনের কলাকৌশল আছে, উপায় আছে–সেগুলো রপ্ত করতে হবে। ছেলে-মেয়ে উভয়কেই করতে হবে। এটা বিপ্লবী দলের প্রয়োজন। আমাদের কর্মীরা অনেক সময় কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। নিজের সংগঠনের বাইরে ভাবেন না। এটাও কিন্তু একটা আঞ্চলিকতা অর্থাৎ Organizational Fanaticism। নিজের সংগঠনটা নিয়েই শুধু ভাবি, সমস্ত দল নিয়ে ভাবতে পারি না। বিপ্লবী সবসময় শুধু একটা জায়গা নিয়ে ভাবে না। সে Versatile হয়ে ভাববে। সবকিছু দেখার যে প্রজ্ঞা সেই স্তরে তার চেতনাকে সে বিকশিত করবে। বিপ্লবী কর্মী হিসেবে যদি সবকিছুর দায়িত্ব নেয়ার মনোভাব থাকে, তখন তো দল শক্তিশালী হবে, দল আরো বড় ও বিকশিত হতে পারবে। ক্ষুদ্র চিন্তার গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর চিন্তার মধ্যে নিজেদের ফেলতে হবে, সকল সংগঠনকে বিকশিত করার মনোভাব থাকতে হবে। সব সংগঠনকে বড় করতে হবে। তখনই একমাত্র, সেই পরিবেশে সবাই বড় হবে। সবচেয়ে বড় যে

আছে, সে আরো বড় হবে। বড় হওয়া একটা বড় সংগ্রাম। জ্ঞানে বড় হওয়া, উচ্চ মানবিকতা এবং মনুষ্যত্বে বড় হওয়া, দায়বদ্ধতায় বড় হওয়া খুব দরকার। জীবনটাতে দায়বদ্ধতা বেশি। ব্যক্তিগত বিষয়টা খুব কম। ব্যক্তিগত শুধু আনন্দের রূপটা। আমার মধ্যে যে আনন্দের উপলব্ধি হলো, যে আনন্দ আমি উপভোগ করি–সেটাতো আমারই। এছাড়া আনন্দ উপভোগের যে উপাদান সেটা কিন্তু সকলেরই। ফলে নারী সংগঠন যখন বড় হবে, সে বিভিন্ন সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে–তখন সেই আনন্দ তো আমাদের সকলের।

দলকে সকল দিক থেকে বিকশিত করতে হবে

সমস্ত দিক থেকে বিশাল সম্ভাবনা আমাদের কর্মীদের। দলকে পুরোপুরি বুকে ধরে রাখতে হবে। অনেক ঘাটতি দলের। অনেক অভাব দলের। বাহ্! যে সংসার তোমার সেখানে অভাবটা অন্য জনের আর সুখটা তোমার–এরকম তো হয় না। এখানেই তো দায়বদ্ধতার প্রশ্ন। দায়বদ্ধতা মানে হলো, দলের সকল ক্ষেত্রে যে অভাব–মানবিকতার অভাব, বুদ্ধি-বিবেচনার অভাব, জ্ঞানের অভাব, সবকিছু ধারণ করতে হবে। এছাড়া কিছু হবে না। বিপ্লবী পার্টি ছাড়া বিপ্লব হবে? বিপ্লব ছাড়া নারীর মুক্তি আছে? মানুষের মুক্তি আছে? তাহলে বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রামে আছি আমরা। সেই সংগ্রামের দায়িত্ব সমস্ত কমরেডদের নিতে হবে। ক্ষেপে যাওয়া চলবে না। সমস্যা সমাধানের জন্য তর্ক-বির্তক চলবে। অনেক লড়াই চলবে। তৎক্ষণাৎ ক্ষেপেও যেতে পারি কিন্তু তা চালিয়ে যেতে পারি না। রাগ-ক্ষোভ Continue করতে পারি না। Continue করা মানে হলো ভয়ংকর বিপদ। বুঝতে হবে, পুঁজিবাদের যে অবক্ষয়ী চিন্তা তাকে আমি ধারণ করছি। পুঁজিবাদ আমার ভেতরের যে ব্যক্তিসত্ত্বা, যে অহম–তাকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। এই তোলার পর কিন্তু আমার মাথা চুপচাপ বসে নেই। মাথার ভিতরে কমরেডদের সম্পর্কে নানা ধরনের ভুল চিন্তা তৈরি হচ্ছে। যে কমরেডদের সঙ্গে আমার বিরোধ হয়নি তাদের সম্পর্কেও তৈরি হয়ে যাচ্ছে। সেটা নিয়ে মনকে ভাবাচ্ছি।

মনে রাখবেন কমরেড, 'I can't destroy myself'–এই Guts আমাদের থাকতে হবে। আমার একটা ভুল বলতে চাও, বলো। কিন্তু অহমমুক্ত মানুষ হিসেবে বলতে হবে। আমার হয়তো অহম আছে। কিন্তু তুমি নির্মল মানুষের মতো যদি আমাকে ধরাতে পারো যে, আপনার এই কাজটা তো ভুল। ভুল যদি হয় তাহলে আমার বিবেক আছে না? তা দিয়ে আমি সেই ভুল বুঝতে পারবো। একটা ভুল দেখিয়ে দিলে, আমি যদি সে সময় নাও মানি, বিবেকের কারণে পরে আমি ঠিকই মানবো। অপেক্ষা করো। ভুল মেনে যদি পাল্টে যাই তাহলে তোমার সমস্যা কী? আমি তো পাল্টে গেলাম। তোমার কারণেই পেরেছি। এভাবে কমরেডদের সম্পর্ক হতে হবে। কোনো কিছু ধরে রাখা যাবে না। পাল্টে দিতে হবে। দুনিয়া পাল্টাচ্ছে। ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে। আমার ভাবনা চিন্তাও এগিয়ে চলেছে। এর সাথে মিলিয়ে আমাদের কর্মক্ষমতা, কর্মপদ্ধতি সবকিছুকে পাল্টাতে হবে।

আবার পরস্পরকে সম্মান-শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখার মনোভাব তৈরি করতে হবে।

ভালোবাসা খুবই উচ্চতর মানবিকতার, লেনিনের ভাষায়, সবচেয়ে উচ্চতর মানবিকতা। ভালোবাসা মহত্তম মানুষ সৃষ্টির জন্য। এজন্যই সেটা অনেক বড় মর্যাদার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। পারস্পরিক সম্পর্ক মানেই হলো সকল রকমের ব্যক্তিস্বার্থমুক্ত সম্পর্ক। কোনো একজন নির্দিষ্ট মানুষের জন্য ভালোবাসা আসেনি। ভালোবাসা বাচ্চাদের জন্য এসেছে, বুড়োদের জন্য এসেছে, প্রৌঢ়দের জন্য এসেছে, জনগণের জন্য এসেছে। কত রূপে মানুষ অবস্থান করে, সবার জন্য ভালোবাসা দরকার। এতবড় ভালোবাসা শুধু নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির জন্য বা মানুষের জন্য হতে পারে না। তাহলে ভালোবাসা কোনো দিন বিকশিত হতে পারবে না। সুন্দর হতে পারবেনা। কারণ ভালোবাসা ব্যক্তিস্বার্থমুক্ত না হলে তা ব্যক্তি স্বার্থকেন্দ্রিকতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। ফলে তা আর বিকশিত হতে পারে না। সুন্দর কেন হয় না? মাধুর্যময় কেন হয় না? ভালোবাসা চর্চা করেও তুমি মুখ কালো করে থাকছো কেন? কারণ তুমি অতবড় ভালোবাসাকে একটা লোকের দিকে নিক্ষেপ করেছো, তাতে সবকিছুই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

ভালোবাসাকে সত্যিকাররূপে উপভোগ করার জন্য সে ধরনের সাংস্কৃতিক মান দরকার। রুচিগত-সংস্কৃতিগত উন্নত মান দরকার। সেটাকে বিকশিত করতে হয়। উন্নত চরিত্র ও বড় মানুষ না হলে এই সাংস্কৃতিক মান অর্জন করা সম্ভব হয় না। আবার এই সাংস্কৃতিক মান অর্জন ছাড়া তো বড় মানুষও হওয়া যায় না। উন্নত চরিত্র অর্জনের জন্য ও বড় মানুষ হওয়ার জন্য এই ধরনের সাংস্কৃতিক মান অর্জনের চেষ্টা আমাদের করতে হবে। নয়তো দেখা যাবে ভালো ভালো কর্মীরা অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসে ভুল চর্চার কারণে এক ধরনের কূপমণ্ডূক হয়ে যাবে। এ ধরনের কত ঘটনা রাজনৈতিক জীবনে দেখেছি, কিছু বলছি আপনাদের। দু'জনের মধ্যে খুব ভালোবাসা হলে খারাপ কী? খারাপ কিছু তো নয়। দেখতে হবে ভালোবাসার রূপটা কী? রূপটা মানে হলো কর্মীদের ভালোবেসে চারপাশে আলো জ্বালিয়ে দিচ্ছো কিনা? চারদিকে উজ্জ্বলতা তৈরি করছে কিনা? ঝলমল ঝলমল করছো কিনা? কখনও এমনও দেখা যায় যে, বিয়ের আগে দল ছাড়া দু'জনে কিছু বুঝতো না। দল নিয়ে Concretly মশগুল থাকতো। এছাড়া কিছু জানতো না। বিয়ের পর দেখা গেলো, আস্তে আস্তে দল থেকে সরে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে, ব্যক্তিগত জীবনের দিকে যাচ্ছে। যাচ্ছে তো সেই ডুবে যাওয়ার সমাজে। ধ্বংস হবার পথে। এটা তো হতে পারেনা। সেজন্য আমাদের প্রতিটি চর্চা সচেতন চর্চা হতে হবে। ভালোবাসা একটা শিল্প। যতক্ষণ তোমার মধ্যে শিল্প আছে সেটার প্রকাশ ঘটাবে। যদি মনে হয় এটা এখনও তৈরি হয়নি, তবে তা তৈরি করতে হবে। ওই তৈরি করার মধ্যে যে আনন্দ পাবে, ওর মধ্যে যে সৌন্দর্য তৈরি হবে– সেটাই আলো ছড়াবে।

আমাদের কর্মীরাই আমাদের শক্তি, আমাদের দলকে কেন্দ্র করে সে শক্তি সৃষ্টি করুক। এর জন্যে সর্বস্ব দেয়ার মাধ্যমেই তাদের চরিত্রের বিকাশ ঘটবে। এর সাথে বিরোধ করে কেউ বড় হতে পারবেনা। এটা একটা বিকাশের ক্ষেত্র। আর একাজে আমাদের

সবাইকে খুব সাহসী হতে হবে। অন্যের ভুল যেন আমরা দেখাতে পারি। কারণ আমি ভয় কেন করবো? আমি কী চাইছি? আমার সবচেয়ে প্রিয় কমরেডকে আমি ভুল থেকে মুক্ত করতে চাইছি। আমার ভালোবাসাকে দোষ থেকে মুক্ত করতে চাইছি। এই রকম দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে যে মানবিক সম্পর্ক–সেটাই স্বাধীনতা। মাও সে তুং যেটাকে বলছেন, From the realm of necessity to the realm of freedom। অর্থাৎ প্রয়োজনের স্তর থেকে স্বাধীনতার স্তরে উত্তরণ। স্বাধীনতার স্তরে না পৌঁছালে, নিছক প্রয়োজনের স্তরে থেকে গেলে সেটা তো সাধারণ সম্পর্ক। সেটা উচ্চতর মানবিক সম্পর্ক হতে পারে না।

নারী আন্দোলনের কর্মীদের সবরকম জড়তা ভেঙে উঠে দাঁড়াতে হবে

প্রতি মুহূর্তেই সত্যকে ধারণ করা দরকার। সত্য ছাড়া কোনো উপায় নেই। প্রত্যেকটি কর্মীকেই সত্য ধারণ করে দাঁড়ানো দরকার। এই সংগ্রামে সে কী ভূমিকা পালন করতে পারে–তার মূল্যায়ন করা দরকার। এই মেয়েরা সবাই তো ভবিষ্যতের বিপ্লবী নেত্রী। অনেক নেতা আমাদের দরকার। তোমাদের তা গড়ে তুলতে হবে। শুধু রুটিন প্রোগ্রাম পালন করে এটা গড়ে উঠবেনা। একঘেয়েমি চলে আসবে। নতুন নতুনরূপে মানুষকে আকর্ষণ করতে হবে। কখন, কোন ধরনের, কী আয়োজন করা যায়–তা ভাবতে হবে। মেয়েদের নিজেদের নতুন করে ভেঙে গড়ে তোলাটা খুব দরকার। বহুকাল ধরে জবরদস্তির মধ্যে, কর্তৃত্বের মধ্যে, অবদমনের মধ্যে থাকার কারণে মেয়েরা উদ্যোগী কম হয়। আমি এটা ব্যক্তিগতভাবে কোনো মেয়েকে বলছি না। ব্যক্তিগতভাবে অনেক মেয়েই ছেলেদের থেকে অনেক দিকে এগিয়ে আছে। আমি একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অর্থে কথাটা বললাম, ব্যক্তি বিশেষে তার পার্থক্যও হতে পারে। একটা কথা মনে রাখবেন, এই যে আমরা নির্যাতন কথাটা বলি এর মানে আমরা শুধু শারীরিক নির্যাতনকে বোঝাই তা নয়। পুরনো, শোষণমূলক, বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করতে গিয়ে তার রীতিনীতি মানতে গিয়ে, কখনো সৎভাবে, নিষ্ঠার সাথে তা পালন করতে গিয়েও নির্যাতন হতে পারে।

শত শত বছরব্যাপী এই অবদমনের শিকার হওয়ার ছাপ মেয়েদের শরীরে ও মনে আছে। কম খেয়ে, খেটে খেটে, এক প্রজন্মের পর আরেক প্রজন্ম, এই করতে করতে তাদের আকারও ছোট হয়ে গেছে। মা-বাবা একটু খেতে দেখলে বলেন, বেশি খাবি না। কম করে খা। শ্বশুরবাড়ি গেলে কী বলবে? কেমন শ্বশুরবাড়ি পাবি কে জানে। এভাবে খাবি না। ওভাবে হাঁটবি না। এসব করে করে তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়েছে। মানসিক জগৎ সংকুচিত ও জড়তাগ্রস্ত হয়েছে। যদিও এখন অনেক ব্যতিক্রমও আছে, সেটা আমার আলোচনার বিষয় নয়। আমি সাধারণভাবে কথাটা বলছি। আমাদের দেশের মেয়েরা স্বাধীনভাবে, সাবলীলভাবে, বিকাশের প্রয়োজন অনুযায়ী বেড়ে ওঠার পরিবেশ পায়নি, এখনও পাচ্ছে না। সে কারণে অনেক বড় আদর্শের জন্য ডাকলে মেয়েরা সাড়া দিচ্ছে, অনেকে খুব দারুণভাবেই সাড়া দিচ্ছে, কিন্তু নিজের চরিত্রকে একেবারে ভেঙে গড়ে তোলা বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ চরিত্রে একটা নতুন অভ্যুত্থান

গড়ে তুলবো–সেরকম উদ্যোগ তাদের মধ্যে এখনও অনেক কম।

মেয়েরাও পারবে। এই মহৎ আদর্শকে চেতনায় ধারণ করলে, অনুশীলনে নিয়ে আসলে, লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে নামলে তারাও পারবে। মেয়েদের নির্ভরশীল মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে। মানুষে মানুষে নির্ভরশীলতা থাকেই। কিন্তু এটা সেটা নয়। এটা অন্যরকম। কারও উপর নির্ভর করার প্রবণতা একটু বেশি। এই একটু বেশিটা একটা বিপদ। মেয়েদের গড়ে ওঠার মধ্যেই একটা নিজস্ব ব্যক্তিত্ব থাকতে হবে। এই ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রয়োজনে যে শক্তিশালী মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে হয় তার জন্য। ব্যক্তিগত কোনো কারণে নয়। লক্ষ্য আছে। পরিষ্কার লক্ষ্য আছে। কিন্তু 'Dependent Phycology' (নির্ভরশীল মানসিকতা) থাকলে তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠার মানসিক ধাঁচাটাও সেরকম হয়। তখন ভুলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সবচেয়ে গভীরতম সম্পর্কের ক্ষেত্রগুলিতে গুটিয়ে যায়। এগুলোও মেয়েদের খেয়াল রাখতে হবে।

আমি অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের বিভিন্ন বিষয় নানা দিক থেকে বললাম। আরো বহু কথা আছে। নর-নারীর যৌন সম্পর্ককে কেন্দ্র করে বলতে চাই, আমি যদি সম্পত্তিমুক্ত মানসিকতাকে ভিত্তি করে কারও সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্কে যেতে চাই তাহলেই একমাত্র সকল রকমের দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। যৌন দাসত্বে আবদ্ধ থেকে যেতে পারি, যদি সম্পত্তিজাত মানসিকতা দ্বারা পরিচালিত হই। সকল রকমের সম্পত্তিজাত মানসিকতা থেকে মুক্ত থাকতে হলে অহম থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রাম করতে হবে। অহম ধারণ করে এটা সম্ভব নয়। স্বাধীনতা মানে যথেচ্ছ চলা নয়, নিজের অহমকে গুরুত্ব দিয়ে চলা নয়। 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে রাজেন বলেছিলো, "আমাদের নীতি হলো নিয়মের শাসন ও সংযম।" এটা মনে রাখতে হবে। কারণ এ বিশ্বে কোনো কিছুই নিয়মের বাইরে নেই। উচ্চতর মানবিকতায় পরিচালিত হওয়ারও একটি নিয়ম আছে। সেই নিয়মকে কেন্দ্র করেই মানবিকতাকে বিকশিত করতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকশিত করতে চান? সেটাও সামজিক প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে, তাকে বিকশিত করার নিয়মকে অনুসরণ করে, তার পরিপূরক সংগ্রাম করার মাধ্যমেই করতে হবে।

আমাদের মেয়েদের আন্দোলন-সংগ্রামগুলি গড়ে তুলবার জন্য আরও একটু ভাবনা থাকা দরকার। কোন ধরনের কাজের মাধ্যমে ব্যাপক মেয়েদেরকে আনতে পারি? এমন কিছু মেয়েদের বেরিয়ে আসা দরকার যারা গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিগুলোতে গিয়ে বসে থাকবে। সেখানে গার্মেন্ট শ্রমিকদের সাথে ছুটির সময়, অবসরের সময় কাটাবে। তারা যেসব জায়গায় বেশি থাকে সেসব জায়গায় যেতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য আমার মাথায় আছে। আবার নারী প্রশ্নকে কেন্দ্র করে তাদের কতখানি এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি সেই প্রশ্নেও যেতে হবে। দু'চারজন কমরেড বেরিয়ে আসতে হবে যারা শরীরে-স্বাস্থ্যে-দীপ্তিতে মেয়েদের নেত্রী হবার মতো করে উপস্থিত হতে পারে, মেয়েদের নেতৃত্ব দিতে পারে। তাদের মধ্যে কাজ করতে পারে, তেজস্বী বক্তৃতা দিতে পারে, প্রবল আবেগে মথিত করতে পারে।

গৃহপরিচারিকারা একটা বিরাট সেক্টর শহরগুলোতে। এরা অনেকেই গ্রামের সাথে একবারেই সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে শহরে এসেছে। এ সেক্টরে কাজ গড়ে তোলা উচিত। এই সেক্টর একটা বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে দাঁড়াতে পারে।

মেয়েরা সাহসের সঙ্গে এই লড়াইটা করবে। ভালোলাগা তো থাকবেই। জনগণ আমাকে ভালোবাসবে, এটাই আমার মধ্যে ভালোলাগা তৈরি করবে। গরীব মানুষেরা কত যে ভালোবাসতে পারে। ওরা 'আপা, আপা' করে প্রাণ দিয়ে দেবে। এমনিতে হয়তো পার্টির সমাবেশে ডেকেছেন, আসেনি। কিন্তু আপনার জন্য দৌড়াবে। আপনার জন্য দৌড়াক আগে। আপনাকে আগে ভালোবাসুক। তারপর আপনার দলকে চিনতে পারবে। আপনি তো Identified দলের সঙ্গে। আপনাকে ভালোবাসার মধ্যে তো কোনো সমস্যা নেই। আস্তে আস্তে তারা পার্টিকেও ভালোবাসবে। আমাদের নারী আন্দোলনের কর্মীদের এইক্ষেত্রে, এইভাবে কাজ করানোর মতো মানুষ বের করতে হবে। লক্ষ লক্ষ মেয়েরা আছে এই গার্মেন্ট সেক্টরে। তাদের মধ্যে থেকে কাজ করতে হবে। আমরা এমন কতগুলো জায়গায় যাচ্ছি যেখানে Dificulty বেশি। সবচেয়ে Dificult জায়গায় যাবো কেন? সবচেয়ে সহজে টানতে পারি, এমন জায়গায় আগে যেতে হবে। কোথায় বুর্জোয়ারা সবচেয়ে দুর্বল হয়ে আছে সেখানে আগে আঘাত করতে হবে। বিপ্লব তো সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় আগে করতে হবে। ফলে কোন জায়গায় প্রথমে যাবো তা ঠিক করতে হবে। সঠিক প্রক্রিয়ায়, সঠিক জায়গায় কাজ করতে হবে।

যথার্থ আদর্শগত সংগ্রামের ভিত্তিতে সংগঠন বড় করতে হবে

পুঁজিবাদী শাসন-শোষণে পিষ্ট সাধারণ মানুষ নৈতিকভাবে, যৌক্তিকভাবে, রুচিগত দিক থেকে এখনও একটা মানের জায়গায় ওঠেনি। সাধারণ মানুষকে এই নৈতিক-যৌক্তিক-সাংস্কৃতিক-রুচিগতভাবে গড়ে তোলার আন্দোলন আমাদেরকেই করতে হবে। আর নৈতিক-যৌক্তিক-সাংস্কৃতিক-রুচিগত দিক থেকে তাদের পাল্টাতে পারলেই আপনার কাজ এগিয়ে যাবে। তখন তাকে কোনো লোভ দেখিয়ে কেউ রাস্তা থেকে টলাতে পারবেনা। বরং তখন যত লোভ দেখাবে সে তত প্রতিক্রিয়া দেখাবে, এ ব্যবস্থার উপর তত তার ঘৃণা বাড়বে। এই পাল্টানোর সংগ্রাম আমরা কীভাবে করবো? এর জন্য সমস্ত দিক থেকে আমাদের বিকশিত হতে হবে। এইভাবে বিকশিত হওয়ার জন্য আমাদের কর্মীদের একটা 'Daring Attitude' দরকার। মেয়েদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে বের করো। কারা কারা লেগে থাকবে এটা নিয়ে, সেটা ভাবো। কোন কাজটা, কোন বিষয়টা কিভাবে করলে ঠিক হবে, কোথায় কোন আন্দোলন দাঁড় করাবে–সেগুলো তোমরা সুন্দরভাবে গুছিয়ে নাও। সমস্ত বাংলাদেশের মেয়েদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কী কী সমস্যা–তা নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। কী কী সংকট আছে? অর্থনৈতিক সংকট আছে, জুলুম-নির্যাতনের সংকট আছে, সাংস্কৃতিক-নৈতিক সংকট আছে। আবার এক একটি ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ভেদে মেয়েদের অবস্থার পার্থক্য আছে। সেটা কী? তার প্রকৃতি কী? এ সমস্ত কিছু বিচার-বিশ্লেষণ করে তাদের মধ্যে প্রবেশ

করতে হবে। সেগুলিকে সুনির্দিষ্ট করে রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ করতে হবে। চিন্তাশীল হতে হবে নারী আন্দোলনের কর্মীদের। এভাবে কাজে ডুবে গেলে তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা কমে যাবে। অনেক গুণ আছে অনেকের মধ্যে, সেগুলিকে উন্নত রূপ দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। নিজেদের মধ্যে দারুণ বন্ধুত্ব দরকার। মেয়েরা কিন্তু অনেক ক্ষুদ্র পরিবেশের মধ্যে থাকে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের বড়ত্ব একটু কম। খুচরো ব্যাপার নিয়েও ঠোকাঠুকি লেগে যায়। এসব করলে কীভাবে বিপ্লবী রাজনীতি করবে? এসব কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থের যে ক্ষেত্র আছে ওখান থেকে সৃষ্টি হচ্ছে। যার যেমন আছে, তার তেমন প্রতিক্রিয়া। কিন্তু প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু মাত্রায় এই ক্ষেত্র আছে। সেখান থেকে সবাইকে মুক্ত হতে হবে।

বিবাহিত নারীদের বলছি, নিজেদের স্বামীকে নিয়ে আপনাদের তোলপাড় করতে হবে। আপনার একটা ক্ষেত্র আছে কাজ করার। মিছিল-মিটিং এ দুদিন এসে ঘুরে গেলে চলবে না। আপনার স্বামীকে আপনি দলের স্বার্থ নিয়ে মগ্ন থাকতে বলুন। আপনি একজন শিক্ষিত নারী। আপনি অনেক মেয়েদের মধ্যে দলের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে নিয়ে যেতে পারেন। আপনার যেগুলি বোঝবার বাকি সেগুলি আগে বুঝে নিন। তারপর নেমে যান। এভাবে প্রবল গতি নিয়ে আপনাদের কাজ করতে হবে। এখানে কেউ দর্শক হয়ে থাকবেন না। সক্রিয় থাকতে হবে। আপনার ভূমিকা কী? আপনি কতজন মানুষকে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন? এটা আপনাকে সবসময় ভাবতে হবে।

সামর্থ্যের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে সবার এগিয়ে আসতে হবে

আমি এতক্ষণ ধরে যে আলোচনাটা করলাম, সেটি মূলত আমাদের দলের যে সকল কর্মীরা এই সংগঠনটি গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত তাদেরকে কেন্দ্র করে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে আমি কিছু কথা বললাম। এখানে নতুন কোনো কথাই আমি বলিনি। যা বলেছি তা হলো, তাঁদের শিক্ষার ভিত্তিতে এই সময়ের প্রেক্ষিতে কাজের কিছু দিক-নির্দেশনা মাত্র।

তবে মনে রাখতে হবে, এই সংগঠনটি একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্লাটফর্ম। গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন সকল নারীদের তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রতিবাদ করা দরকার, এই সংগঠনকে গড়ে তোলা দরকার। আদর্শ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঠিক, আবার আমার আদর্শকে আপনি সবদিক থেকে ঠিক নাও মনে করতে পারেন, কিন্তু আপনার উপর চলতে থাকা অপমানকে তো ঠিক মনে করেন না। তা যদি মনে না করেন, তবে আমাদের সাথে সেই অপমানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হোন। যদি আমাদের মধ্যে লড়াইয়ের তেজ দেখেন, আপোষহীন মনোভাব দেখেন, কিছু একটা সত্যিই করতে চাই এমন দৃঢ়পণ দেখেন তবে আমাদের ডাকে সাড়া দিন। আমরা যতটুকু পারি একসঙ্গে হাঁটি।

এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

-----o-----

বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক, ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা)
ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত। ফোন ও ফ্যাক্স: ৯৫৭৬৩৭৩
E-mail : narimuktikendra@gmail.com

মূল্য : ২০ টাকা